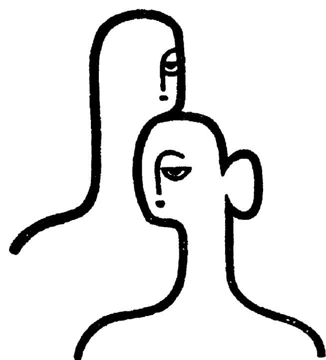


একান্ত আপন

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়



ত্রিবেণী প্রকাশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬৬

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২৮, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
স্কোয়ার প্রিণ্টার্স

ব্লক
সিগনেট ফোটো টাইপ

বাঁধাই
ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

দাম : চার টাকা

প্রিয় বন্ধু

রমাপদ চৌধুরী

করকমলেষু

এই লেখকের

বেগম

মৃগতৃষ্ণা

মাথুর

মধুমতী

রাতভোর

পঙ্কজা

মৌন বসন্ত

রঙ্গরাগ

চন্দন ডাঙার হাট

রাগিণী

পথটুকু হাঁটতে হাঁটতে আসতে ভাল লাগছিল ওঁর।

মাঝে মাঝে এমন হয়। নির্জন পথে আপন মনে চলতে খুব ভাল লাগে। কেন যে ভাল লাগে এটা কখনও ভাবেন নি তিনি। অনর্থক চলা, অকারণে চুপ করে বসে থাকা, এ তো ওঁর বহুকালের স্বভাব।

বিশেষ কিছু যে ভাবেন তা নয়, না ভাববার অভ্যেসটাই সময় সময় ওঁকে পেয়ে বসে। মনটা মেলে ধরেন টান টান করে, অনেক বড় কবে।

কেন? কে জানে।

নির্জন দুপুরে আজও পথ চলছিলেন। রূপ যে তাঁর নেই এমন নয়। বয়েস হয়ত বা একটু বেশী। তবু মেয়ে মানুষ তো?

এ ভাবনাও তখন থাকে না। ভুলেই যান যে নিজে পুরুষ নন। বোধ করি দিনের পর দিন বহু পুরুষের সঙ্গে মিশে মিশে ওদের আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চান না।

মিশতে শুধু নয়, তাদেব দিয়ে কাজ করাতে হয়। হুকুম করতে হয়। তাঁর আদেশ অমান্য করলে অনেক ছেলের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হয়।

বাইশ ছাব্বিশ বছুরে দুরন্ত ছেলেগুলো তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলতেও সাহস পায় না। বুদ্ধিব দীপ্তি আর ব্যক্তিত্বের গাম্ভীর্যে ওঁর নাগালই পায় না তারা।

তার ওপর রূপের রেখা এখনও ম্লান হয়ে যায় নি ওঁর নরম দেহে। ক্ষয়ে যায় নি যৌবনের উদ্ধত ভঙ্গিমাগুলো। বয়েস আটাশ কি আটতিরিশ বুঝতে হলে ভীষণ সন্ধানী চোখেরও সময় লাগে। তবু ভয় নেই। নাকের ওপরটাতে ভ্রূদুটো যখন ওঁর কুঁচকে ওঠে কপালে, কী পরম মনোরম যে দেখতে হয় তখন। ভালবাসলেও শ্রদ্ধায় মাথা নীচু হয়ে আসে।

ভয় বরং তাঁকেই করতে হয়।

আজ হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলেন।

রাস্তায় চলছিলেন খেয়ালে আর খুশীতেও। দুপুরের রাস্তায় বড় বড় বাড়ির ছায়া পড়েছে ফুটপাথে। কোণ ঘেঁষে চলতে বড় ভাল লাগে ওঁর। চলছিলেনও তাই। হঠাৎ রাস্তাটা পার হতে যাবেন, একটা ছোট মোটর গাড়ি তার পাশে খুবই অকস্মাৎ থেমে গেল।

ভয় পেলেন একটু।

বহুকাল পরে আজ প্রথম ভয় পেলেন কাজল বসুমল্লিক। ভয়ে মুহূর্তে মুখখানি ওঁর একেবারে বদলে গেল। চোখে আতঙ্ক, মুখটা ম্লান।

এমন মুখ ওঁব বহুকাল দেখা যায় নি। মুখের ওপরেব একটা কঠিন চামড়া যেন খসে পড়ে গেল অকস্মাৎ। নিতান্তই এক সাধারণ নরম মেয়ের মত কোথা থেকে পড়ল ওঁব মুখে মেয়েলী কমনীয়তার ছায়া, ভয়-তরাসে চোখ দুটোয় বিন্দু বিন্দু মধু।

গাড়ি চাপা পড়লে এমন হত না। গাড়ির চালক ডাকাত হলেও এমন হত না।

গাড়ির চালক অজয়।

প্রৌঢ় সুন্দর ভদ্রলোক। চশমার ভেতর দিয়ে চোখ ফেললেন কাজলের মুখের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে থামালেন গাড়ি। এও কী সম্ভব! এ যে স্বপ্নের চেয়ে অসম্ভব।

কাজল বসুমল্লিক থমকে দাঁড়ালেন। গাড়ির চালককে দেখলেন। মুহূর্তে মুখ থেকে বহুকালের তৈরী এক আবরণ খসে পড়ল। এ কী দেখছেন তিনি! তাঁর মাথা ঠিক আছে তো!

বুকের ভেতরে যেন অনেকগুলো মরচে পড়া তার বেজে উঠল কোন একটা বিগত বাঁধা সুরে। মুখখানি আরক্তিম হয়ে মুহূর্তে আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

কাজল বসুমল্লিক ভয় পেলেন। বহুকাল পরে আজ ভয় পেলেন।

গাড়ির ভেতর থেকে মুখটা বাড়ালেন প্রৌঢ় লোকটি। জলো মেঘের মত ভিজে সে মুখ।

কাজল বসুমল্লিক নীচু মুখ উঁচু করলেন আর একবার।

চোখে কৌতূহল, ভীষণ লজ্জা আর ভয়!

এই সেই অজয়। কত বয়েস হয়ে গেছে অজয়ের। মাথার পিছনের দিকে ছোট একটু টাক। চার পাশের চুলে পাক ধরেছে।

সুদীর্ঘ বাইশ বছর আগের বিহ্বল বসন্ত আজ বিশীর্ণ।

অজয়ের চোখদুটি কিন্তু তেমনি ভাসা-ভাসা। শুধু গভীর প্রশান্তি নেমে এসেছে সেখানে।

ও কি কিছু বলবে? গাড়ি থেকে মুখ বাড়াল। স্তব্ধ শান্ত থমথমে মুখ।

ভয়ে কেঁপে উঠলেন তিনি।

সমস্ত স্নায়ুর শক্তি দিয়ে জোর করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। পা দুটো নিজের কাছে এত ভারী লাগছে। উঠতে আর চায় না। না। এ কিছুতেই হতে পারে না। ভয়ে বুকের ভেতরে শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।

কিছুতেই হতে পারে না। আর কিছু হতে পারে না। কোন কথাও বলতে পারে না। দৃষ্টি নয়, শব্দ নয়, আর কিছু নয়।

জোর করে পা দুটো তুলে চালালেন কাজল।

হাঁপাতে হাঁপাতে খানিকটে রাস্তা যখন পেরিয়ে এসেছেন। শুনলেন গাড়ির সশব্দ চালনা। গাড়িটা বোধ হয় চলে গেল।

একটু একটু করে ঘাড় ফেরালেন। দেখলেন হ্যাঁ, চলেই গেল। গরম পিচের রাস্তার ওপর কঠিন চাকার দাগ ফেলে গেল।

ওঁর মনের ওপর দিয়ে চলে গেল। কঠিন চাকার দাগে মনটা বিক্ষত করে দিয়ে চলে গেল। নির্জন রাস্তাটা বিরাট শূন্য বলে মনে হল যেন।

শ্রান্ত হয়ে একটা নিশ্বাস ফেললেন কাজল বসুমল্লিক। ঘর্মাক্ত দেহটা অবশ লাগছে ওঁর।

পাশ দিয়ে একটা রিকশা চলে গেল টুং টাং শব্দ করে। বিষণ্ণ দুপুরের একটুখানি সুর তুলে গেল।

অতি ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন। বাড়ির দোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ। চাকরটাকে ডাকতেও যেন ইচ্ছে হচ্ছে না আর। পাছে কি একটা সুর নষ্ট হয়ে যায়।

আস্তে আস্তে টোকা দিলেন দরজায়।

দরজা খুলল। একটা কথাও বললেন না। সোজা নিজের ঘরে চলে এলেন, জুতোটা খুলে বসে পড়লেন টেবিলটার সামনে চেয়ারে গা এলিয়ে।

চোখ দুটো আপনা-আপনি বুঁজে এলো। অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে রইলেন।

ভেতরটা আজ ওলট-পালট হয়ে গেল যেন।

কত কথা কত ভাবনার তরঙ্গ উঠছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ। এ ঢেউ রোধ করবার কোন শক্তিই আর পাচ্ছেন না আজ। নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে বসে রইলেন বহুক্ষণ।

অজয় কত গম্ভীর হয়েছে, কত বয়েস হয়ে গেছে ওর।

গাড়িটা কি ওর নিজের ? নিশ্চয়ই ! গাড়ি যখন কিনেছে তখন হয়ত বা ভাল কোন ব্যবসা করছে। অথবা ভাল একটা চাকরিই হয়ত করছে।

পড়াশুনোয় তো বরাবরই ভাল ছিল। ভাল চাকরি একটা পাওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

বিয়ে করেছে কি ?

কাজল বসুমল্লিক মাথাটা দু-হাতে চেপে ধরেন। মনের কোথায় যেন টনটন করে ওঠে। বহুকালের একটা ক্ষতে আবার রক্তক্ষরণ হচ্ছে আজ।

বিয়ে না করবেই বা কেন ? কাজলের জন্যে ও নিজের জীবনটাকে একটুও ভোগ করবে না—এতবড় একটা কিছু আশা করবার অধিকার তো তাঁর নেই।

তিনি তো অজয়কে কিছুই দিতে পারেন নি।

জীবনের কোন একটা বসন্তে যৌবনের প্রলাপ বকেছিলেন অজয়ের সঙ্গে।

প্রলাপ ছাড়া আর কী? প্রলাপ বলে ভাবতেই আজ ভাল লাগে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

তা হলে সেই প্রলাপের কথা আজ এমন একান্ত করে মনে পড়ছে কেন? নিজের মনের কিনারা খুঁজতে গিয়ে সব গুলিয়ে যায়।

সংসারে বোধকরি সবচেয়ে বড় বিস্ময় এইটেই।

কেন যে চিন্তাগুলো মনে আসে!

অজয় কি গাড়ি থেকে নামতে পারত না? নেমে তার কাছে এসে বলতে পারত না,—কেমন আছ? এই সাধারণ ভদ্রতাটুকুও কি অজয় করতে পারত না?

সত্যিই যদি অজয় নামত, তার কাছে এসে দাঁড়াত, আগেকার মত পাগলামি করে তার হাতটাই চেপে ধরত!

হাতটা কি তিনি ছাড়িয়ে নিতে পারতেন? অজয়ের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নেওয়া কি তাঁর পক্ষে সংসারে সবচেয়ে শক্ত নয়?

—কেমন আছ?

তিনি কিছু বলতে পারতেন না? হয়ত বলতেন খুব সহজ স্বরে,—ভালই। তুমি কেমন আছ?

—ভালই।

তারপর? তারপর কথা যে সব ফুরিয়ে যেত।

হয়তো অজয় বলতে পারত, চল না, আমার গাড়িতে একটু ঘুরে আসি।

তিনি রাজী হতে পারতেন না, আজ থাক, তার চেয়ে চল আমার বাড়িতে।

—আজ থাক।—বলত অজয়।

তারপর কথা কি ফুরিয়ে যেত ?

না ফুরোত না।

হয়ত মদনলালের কথাটাই পেড়ে বসত অজয়।

মদনলাল। আজও ভাবলে ঘৃণায় সমস্ত শরীরটা সংকুচিত হয়ে ওঠে কাজলের।

থাক মদনলালের কথা।

তবু যদি অজয় বলত, একটা কথা জানবার জন্যেই এতকাল অপেক্ষা করে ছিলাম।

—কী ?

—তুমি কি মদনলালকে সত্যিই ভালবাসতে ?

কী উত্তর দিতেন তিনি ? না— বলবার শক্তি তাঁর কোথায় ? আজ আর সে কথা গলার সবটুকু জোর দিয়ে অস্বীকার করলেই বা কি সুরাহা হত।

আজ অস্বীকার করার আর হয়ত কোন মানে হয় না।

অনেকগুলো বছর পিছিয়ে যেতে আজ তিনিও পারবেন না। অজয়ও পারবে না।

কিন্তু স্বীকার করতেই বা কি করে পারতেন ?

এ কথা তো আজও তিনি নিশ্চিত জানেন যে এর চেয়ে বড় মিথ্যে আর নেই। মিথ্যেকে স্বীকার করেই হয়ত নিতেন।

কিন্তু সেই স্বীকারের যে কী জ্বালা। যাকে মনে প্রাণে জানি মিথ্যে, তাকেই সত্যি বলে জোর গলায় ঘোষণা করতে হচ্ছে। এ জ্বালার বিষ যে কত তীব্র তা মর্মে মর্মে অনুভব করছেন তিনি।

ছিঃ! ছিঃ! এত অনর্থক কল্পনা করতে লজ্জা হচ্ছে না তাঁর। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে মাথা থেকে হাত নামান কাজল বসুমল্লিক।

নজরে পড়ে সিঁথি থেকে একটু সিঁদুর মুছে এসেছে হাতের তেলোয়।

সিঁদুর তো অজয় নিশ্চয়ই দেখেছে। কী ভেবেছে ?

যদি বলত, তোমার স্বামী কী করেন ?

কী জবাব দিতে পারতেন তিনি ?

অথবা যদি বলত, চল তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করে আসি।

কী করে প্রত্যাখ্যান করতেন তিনি ?

তাঁর মুখখানা কি পাণ্ডুর হয়ে উঠত না ?

দৃষ্টিটা নেমে যেত না মাটিতে ?

কী জবাব দিতেন তিনি যদি অজয় জিজ্ঞেস করে বসত, তোমার স্বামী কী করেন ?

যা করেন তা কি বলা যায় ? কোথায় তিনি থাকেন তাও কি বলা যায় ?

সিঁদুরটুকুই শুধু আছে, আর আছে কী ? আর একটি চিহ্ন রয়েছে। মায়া। তাঁর একমাত্র কন্যা মায়া। তাঁর স্বামীর ওই একটি মাত্র করুণা।

করুণা ছাড়া আর কী ? তাঁকে তো করুণা করেই গেছে শুধু। তিনিও তাই স্বামীকে আজও করুণাই করেন। স্বামী নামক জীবটিকে আর তিনি ঠিকমত বুঝতেই পারলেন না আজ পর্যন্ত। ওকে ঘৃণা করা যায় না, ভালবাসাও যায় না।

একটা পাথরকে কি ভালবাসা যায়, না ঘৃণা করা যায় ?

তবু কোথায় যেন এক জায়গায় তিনি স্বামীর জন্যে একটুখানি শ্রদ্ধা খুঁজে পান। কারণটা—থাকগে। স্বামীর কথা অজয়কে কিছুই তিনি বলতেন না।

যাকে ভুলতে হবে, তাকে ভুলে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু অজয়কেও তো ভুলতে হবে। ভুলতেই হবে তাঁকে। এতকাল ধরে শুধু ভুলে যাবার চেষ্টাই তিনি করেছেন।

ভুলে যাবার চেষ্টা করেই কী ভুল করেছেন তিনি ?

নাঃ! লাগাম-ছাড়া কল্পনাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। চেয়ার থেকে উঠে পড়েন কাজল বসুমল্লিক। ঘরে পায়চারী করতে থাকেন। অনেকবার ঘোরাফেরা করেন।

পার্টির কথা চিন্তা করবার চেষ্টা করেন।

চোখ থেকে মুছে ফেলে দিতে চান নরম বেদনার আভাসটুকু পর্যন্ত। জীবনটা অতি কঠোর। সামান্য বেদনায় আর অতি শিশু-সুলভ ভাবাবেগে মুষড়ে পড়বার জন্য তাঁর জীবন নয়।

কাজল বসুমল্লিক সোজা হয়ে দাঁড়ান। ঠোঁটদুটো কঠিন হয়ে ওঠে। ভ্রু-দুটো কুঁচকে ওঠে আপনা-আপনি। মনের চাঞ্চল্য কমে আসে ধীরে ধীরে।

আস্তে আস্তে এসে বসেন চেয়ারে। সোজা হয়ে বসেন।

ঠিক এই রকম মুহূর্তে অজয় যদি তাঁকে বলতে আসত, কেমন আছ ?

তিনি নিশ্চয়ই ভ্রূ-দুটো কুঁচকে বলতেন, আপনাকে তো চিনি না। কে আপনি ?

জানেন অজয়েব মুখখানা মেঘের মত কালো হয়ে যেত। লজ্জায় মুখ নীচু করে হয়ত বলত, মাপ করবেন।

অথবা আর একবার আশা নিয়ে বলত, আমি অজয়।

তিনি দ্বিগুণ কঠিনস্বরে বলতেন, কে অজয় ? কী বলছেন আপনি ?

অজয় এর পবে কি আর দাঁড়াতে পারত সোজা হয়ে ?

সত্যি সত্যি কি তিনি ওর সামনে এত কঠিন হতে পারতেন ? না পারার তো কারণ ছিল না। কঠোরতাকেই তো এ জন্মের সাধন বলে গ্রহণ করেছেন। সংযমকে সবচেয়ে প্রিয় বলে আলিঙ্গন করেছেন। সংযমের চেয়ে বড় জিনিস কি সংসারে আর আছে।

ভাবতে ভাবতে চোখ পড়ে আকাশের দিকে।

বিকেল হয়ে এসেছে। আকাশটা কিন্তু একটুও কঠিন নয়। তুলোর মত নরম মেঘ আলতো করে ছুঁয়ে চলেছে আকাশে।

ঝির ঝির করে একটু বৃষ্টিও পড়ছে। নরম মেঘ গলে পড়ছে বিন্দু বিন্দু হয়ে।

তিনি কি কখনও এমন করে গলে পড়তে পারেন না ?

বিহ্বল হয়ে পড়েন কাজল বসুমল্লিক। কিছুক্ষণ সময় কেটে যায় চুপচাপ। মনটা নরম হয়ে আসে, শান্ত হয়ে আসে।

এক ফালি মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে খোঁপার ওপর আর বাঁ কাঁধে শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে। বিকেলের নরম রোদ, এক পশলা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে গেল। আকাশে পশ্চিম থেকে ভেসে চলে গেল ভিজে মস্ত এক খণ্ড মেঘ। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

গায়ের শাড়িটা আর একটু ভাল করে জড়িয়ে নিতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু হাত ওঠে না।

আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে বিহ্বল বিভ্রান্ত হয়েছিলেন কাজল বসুমল্লিক।

মিষ্টি রোদের আভা আরামের আলতো আঙ্গুল বুলিয়ে দিল ওঁর মনে।

কি যেন হারিয়ে গেল। কি যেন ভুল হয়ে গেল।

আবার মুহূর্তের ভেতর মনটাকে টান-টান করে তুললেন কাজল। বিহ্বল দুটি চোখের পাতা নামালেন আকাশ থেকে।

আবার নিজেকেই নিজে ছি-ছি করলেন এই সাময়িক দুর্বলতার জন্যে।

দুর্বলতাই তো! বিভ্রান্তিই তো!

আবেগকে শুধু সংযত করা নয়, পিষে দুমড়ে রাখলেন মনের নিচে। নিজের মনে-মনে হাসিতে দেখা গেল ওঁর সাজানো সুন্দর দাঁতের একটুখানি।

পাতলা ঠোঁটদুটো কঠিন হয়ে উঠল, চোখদুটো আবেগশূন্যতার এক নির্মম ভঙ্গিতে ভরে উঠল। জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে টেবিলের চিঠিগুলোর ওপর নজর দিলেন।

অনেক কাজ। অনেক দায়িত্ব।

পাটুলী থেকে চিঠি এসেছে। ওখানে পার্টি অফিসে অনিল বর্ধনের নামে লিখেছে হাসি রায়। হাসির চিঠিটা যদি কিছুমাত্র সত্যি হয়, তাহলে অনিল বর্ধনকে আর ক্ষমা করা চলে না।

ছেলেটা কর্মী হিসেবে ভাল। কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে কেমন একটা দুর্বলতা ওর সবচেয়ে বড় দোষ। ওতেই ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাবে। একটু কড়া করে লিখতে হবে ওকে।

এ-ধরনের দুর্বলতাকে কোন মতেই প্রশ্রয় দিতে পারবেন না কাজল বসুমল্লিক। একটুতেই যাদের মনে রঙিন বাষ্প জমে, তাদের দিয়ে খুব কাজ হয়ে উঠবে না। বিশেষ করে ওখানে পার্টির কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবে হওয়া দরকাব।

অনিলের এ কথা তো ভোলা উচিত নয় যে ওখানে মাত্র সাড়ে তিনশ ভোটের জন্যে গেলবারের নির্বাচনে তারা হেরে গিয়েছে।

হাসি রায়। মেয়েটাকে কয়েকবার দেখেছিলেন তিনি। ওরই বা অনিলের ওপর এত রাগ কিসেব? ওর নামে এমন একটা চিঠি লেখবার কী প্রয়োজন ছিল।

ওখানে পার্টিব ভেতব গোলযোগ বেশ ভাল করেই দেখা দিয়েছে। কী যে করা যায়?

এতক্ষণে শাড়িটা ভাল কবে গায়ে জড়িয়ে নেন উনি।

ভাবনায় টানা-টানা ভ্রূব মাঝখানটা কুঁচকে ওঠে আবার।

গোটা-কয়েক সাধাবণ নির্দেশ দিতে হবে বর্ধমানের কেন্দ্রে। এখানকাব বসাক মশাইকে যেতে বলতে হবে পাটুলীতে। ব্যাপারটা সরজমিনে তদন্ত করে আসাই ভাল।

আরও যে কত কাজ!

আস্তে আস্তে চেয়াব থেকে ওঠেন কাজল বসুমল্লিক।

মসৃণ কপালেব ওপর থেকে কয়েকটি খুচরো চুল সরিয়ে দেন। দুবার পায়চারি কবেন ধীবে ধীবে। আজ আবার সাতটায় জরুরী একটা মিটিং। তার আগেই চিঠিব উত্তব ক'টি লিখে ফেলতে হবে। তবু কেন যে আজ আব লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

নিজেকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছেন না। কি এক অসহ্য বিরক্তিতে জ্বলছেন।

কী যে এই জ্বালা।

এই জ্বালাই কি তাঁর আটত্রিশ বছরের জীবনের সম্বল! আটত্রিশটা হেমন্ত কেটে গেছে তাঁর জীবনে।

কিন্তু আজ এই হেমন্তে ঠাণ্ডা গরম সন্ধ্যায় কেন যে তিনি বার বার বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন!

নিজেকে শাসন করতে করতে শ্রান্ত হয়ে আবার টেবিলের সামনে বসে পড়েন কাজল বসুমল্লিক। এত বড় একটা পার্টির অনেক দায়িত্ব তাঁর ওপর। তাঁর জীবনে অতীত ভুলে যেতে হবে।

জীবনের ভবিষ্যতকে আমল দিলে চলবে না।

অন্য চিন্তা ভুলতে হবে। দেহও ভুলতে হবে।

দেহ তিনি যে একজন মেয়ে, তাঁর গায়ের রঙ যে মাজা মসৃণ, তাঁর চোখ দুটো ডাগর কালো, তাঁর দেহের কানায় কানায় যে আঠারো বছুরে দুরন্ত যৌবনের অবশেষ এখনও আছে, এ কথা তো চিন্তা করতে তিনি চান নি, জোর করে অস্বীকার করেছেন এ দেহকে।

হঠাৎ সেদিন খেয়াল করিয়ে দিল মায়া। ওঁর একমাত্র কন্যা।

মায়ের কপালটায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, ফিক করে হেসে—তুমি কি সুন্দর দেখতে মা।

তাকালেন কাজল বসুমল্লিক।

ভ্রূদুটো কুঁচকে উঠল। তাকালেন মায়ার দিকে।

মায়ার চোখ দুটোতে কালো ভ্রমরের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলেন তিনি।

কথাটা মায়া বিশেষ কিছু একটা মনে করে বলে নি। তবু—।

—কাজের ভেতর দিয়ে মানুষ সুন্দর হয় খুকী, দেহে নয়।

উপদেশটা অতি নীরস, কঠোর।

উনিশ বছুরে যৌবনচঞ্চল মায়া শুনল, কী যে বুঝল কে জানে। মুখটা একটু বিষণ্ন হয়ে উঠল শুধু।

তবু তেমনি হঠাৎই বললে আবার, একদিন তুমি যদি সব কাজ ছেড়ে দাও মা?

কাজল বসুমল্লিকের টানা-টানা চোখ দুটোয় ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল,

এমন প্রশ্ন তোমার মনে এল কি করে খুকী। কাজ ছাড়া মানুষ বাঁচে না।

মায়া একটু ভয় পেয়ে যায় মায়ের চাউনিতে, বলে, না, বলছিলুম এই সব কাজ।

—এ সব কাজ গেলে, অন্য কাজ আসবে।

আর কোনও কথা বলে নি মায়া।

তাহোক। তবু মেয়ের মুখের ওই কথাটা আজ কেন মনে পড়ছে আবার। তুমি কী সুন্দর দেখতে মা! বহুকাল যেন কারও মুখে এ কথাটা শোনেন নি। বহুকাল। কতকাল হয়ে গেল। স্বামীও কি কখনও বলেছিলেন? না। মনে পড়ে না।

যাক ও সব ভাবনা। চিঠিগুলোর জবাব দিতে হবে। পার্টির মিটিং সাতটায়। বিধান সভার একটা বিলের সম্বন্ধে পার্টির গোপন আলোচনা আছে।

গা ঝেড়ে উঠে পড়েন কাজল বসুমল্লিক।

কিন্তু সামনের দোতলার বারান্দায় চোখ পড়তেই ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে আবার।

ও ছেলেটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসছে কেন?

তাঁর পাশের ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে আছে যেন মনে হয়। ও ঘরে তো মায়া সেতার বাজাচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে। সুরের রেশটা কানে আসছিল তাঁর।

সর্বশরীরে আবার একটা বিরক্তির জ্বালা।

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে মায়ার ঘরের দিকে এগোলেন। দোরটা আধখানা খোলা। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন।

মায়া সেতার বাজাচ্ছে, কিন্তু চোখ দুটো বার বার গিয়ে পড়ছে সামনের বাড়ির দোতলায় ওই ছেলেটার দিকেই। ওদের দুজনের চোখে এক অদৃশ্য সরলরেখা।

মায়ার ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক। মনের দুষ্টুমি হাসিতে ঠোঁট দুটোর বিশেষ ভঙ্গি কাজল বসুমল্লিকের চোখ এড়ায় না।

একটু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। ওঁর ঠোঁটেও এক কঠিন হাসির আভাস দেখা দেয়। আস্তে আস্তে ঘরে ঢোকেন।

ঝম করে সেতারের তারগুলো একসঙ্গে বেজে উঠে থেমে যায়। মায়া চমকে তাকায়।

ছেলেটা পালায় না। কিন্তু তার চোখ তখন আকাশে। ফাঁকা আকাশে কি একটা আবিষ্কার করতে থাকে ছেলেটা।

মায়া সামলে নিয়ে আবার সেতারের টুং টাং আওয়াজ করতে থাকে।

কাজল বসুমল্লিক আস্তে আস্তে মায়ার কাছে এগিয়ে আসেন।

চাকর চা নিয়ে আসছে।

—এদিকে শোন্।

চাকরটা এগিয়ে আসে।

কাজল বসুমল্লিক মায়ার দিকে একবার তাকিয়ে চাকরটাকে বলেন, আমার নাম করে ওই বাড়ি থেকে ওই ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে আয়।

মায়ার হাত কাঁপে, তবু সেতার বাজাতেই থাকে, পাছে বাজনা বন্ধ করলে তার সঙ্গে কিছু কথা বলবার সুযোগ পান মা।

চাকরটা চলে যায়।

কাজল হাসেন। তিনি জানেন, ছেলেটি নিশ্চয় আসবে।

তাঁর আদেশ অমান্য করবার সাহস এ পাড়ায় কারও নেই। পাড়ার অনেকেই তাঁর কাছে সার্টিফিকেট নিতে আসে, চাকরি পাবার আশায় আসে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে বসেন কাজল।

—খুকী!

মায়া চমকে তাকায়।

এবারে বাজনাটা বন্ধ করতে হয়।

মায়ার নাকের ডগা ঘামছে, ছোট্ট কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। কান দুটো কেন যে এত গরম লাগছে বুঝতে পারে না মায়া।

ভাসাভাসা চোখদুটো তুলে একবার মায়েব দিকে তাকায়। পরমুহূর্তেই চোখ নামিয়ে ফেলে। চোখের ঘন পল্লব মেঘের মত ঢেকে দেয় চোখের দৃষ্টি।

—বাজনা তোমার শেষ হল ?

—না, মা, আরও কয়েকটা গৎ বাজাতে হবে।—মায়ার গলা কাঁপছে।

—ওই ছেলেটা বুঝি তোমার বাজনা শুনছিল ?

মায়া চোখ দুটো বিস্ফাবিত কবে বলে—জানি না তো মা! শুনছিল নাকি ?

—হ্যাঁ। শুনছিল। তোমাব বাজনা সত্যিই শোনবার মত হয়ে উঠছে।

কথাটা কোন দিকে যাচ্ছে মায়া ঠিক বুঝতে পাবে না।

—তা বাজনা শুনতে হলে অত দূব থেকে কান পেতে শুনতে তো কষ্ট হয়। ঘবে ডেকে বসিয়ে শোনালে পাবতে ?

মায়াব সর্বাঙ্গ ঘামছে। কান দুটো গবম হযে ওঠে আবও।

—এবপব যখনি ও শুনতে চাইবে, ঘরে এনে বসিয়ে বাজনা শোনাবে। বুঝলে ?

বুঝবে আর কি! মায়েব এ কথার পবে আব কি কোনও জবাব দেওয়া যায়।

—তাছাড়া, ওব সঙ্গে তো তোমাব আলাপ আছে ?

মায়া যেন আকাশে ওঠে : আলাপ ? কই, না তো ?

—ছেলেটি কিন্তু শুনেছি ভাল। ওর নাম জান ?

—নাম!

—নাম শোন নি ওর ?

—নাম! হ্যাঁ, শুনেছি বোধহয়। ওর বোন আমাদের কলেজে পড়ে তো ? গৌরী দাসগুপ্ত।

—তাই নাকি ? তা গৌরীকে ডাকলেও পারতে ?

মায়া দম নেয়। মায়ের কথাগুলো যেন খানিকটে সহজ হয়ে

এই বয়েসটায় এমন মূর্খামি কি করতেই হবে ? কেউ কি এই রঙিন সূক্ষ্ম জাল থেকে রেহাই পেতে পারে না ?

পারে। নিশ্চয়ই পারে। মায়াকে তিনি কিছুতেই এই ভুল করতে দেবেন না। কিছুতেই না। যেন এক অজ্ঞাত আক্রোশে ফুলতে থাকেন কাজল বসুমল্লিক।

তাঁর জীবনেও এই রকম বোকামির কতকগুলো দিন কালো দাগ ফেলে চলে গেছে। সেই কাজল-কালো দাগ তিনি মুছে ফেলেছেন।

জোর করে মুছে ফেলেছেন। মুছতে কি পেরেছেন ?

যতই ভাবেন মুছে ফেলেছেন, ততই জিজ্ঞাসাটা আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে।

ইচ্ছে হয় সুতীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে জীবনের ওই দিনগুলোকে কুচো-কুচো করে কেটে ফেলে দেন মহাকালের আবর্জনায়।

কিন্তু—

ওই 'কিন্তু'টাই তাঁকে মাঝে মাঝে ভাবায়। মহাকালেব বিচিত্র সৃষ্টিতে বোধ করি আবর্জনা কিছুই নেই। কিছু ফেলে দেওয়া যায় না। কিছুই হারায় না।

কেন হারায় না ? হারিয়ে যাক। ধুয়ে যাক। মুছে যাক।

কাজল বসুমল্লিক আক্রোশে আরক্তিম হয়ে ওঠেন। চেয়ারে বসে পড়েন।

মায়ার কথা ভাববার সময় এসেছে, পরিষ্কার বুঝতে পারেন আজ। বুঝতে পারেন, মায়া বড় হয়েছে। যৌবনের বিষাক্ত রসে ভরে উঠেছে মায়ার সর্বাঙ্গ।

মায়াকে দেখলে চোখে যেন জ্বালা ধরে আজকাল। যৌবনের মত্ততার ঝাঁজ সহ্য করতে পারেন না। তবু সইতে হবে। আগলাতে হবে মায়াকে।

মাঝে মাঝে পাশে শুয়ে মায়া যখন ওর নরম দীঘল দুখানা হাত দিয়ে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে, তখন মায়ার অঙ্গের উত্তাপ অনুভব করে

তিনি চমকে ওঠেন। সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। মায়াকে বেশ সুন্দর লাগে দেখতে। মায়া যে সুন্দরী এ কথা মা হয়েও অস্বীকার করতে পারেন না তিনি।

এই যৌবনকে কী করে আগলাবেন তিনি ভেবে পান না।

মনে হয় অনেক ঝাঁক কাকের কাছ থেকে আগলাতে হবে এই একটুকরো নরম মাংসকে। নইলে ওর জীবনে মৃত্যুকে আটকাতে পারবেন না।

মায়াকে বাঁচাতে হবে।

মনটাকে কঠোর করে তুলেছেন কাজল বসুমল্লিক।

মায়া পাশের ঘরে বসে আছে তখনও সেতারটা সামনে রেখে। কেন যে মা এত কঠোর হন ওর ওপর, ভেবে ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিছুই তো করে নি সে। গৌরীর দাদার সম্বন্ধে তার কোনও দুর্বলতাই নেই। কিছুমাত্র না।

যদি সেতার বাজাতে বাজাতে দুবাব তাকিয়েই থাকে ওর দিকে, কী এমন অশুদ্ধ হয়ে গেছে বাড়িখানা? তা ছাড়া কোনও ছেলের দিকে সুস্মিত মুখে তাকানো যে কী অপরাধ কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না ও।

মায়ের ইঙ্গিতটা এতই স্পষ্ট আর এতই অপমানকর যে সহ্য করা যায় না।

কেন যে মা এমন করলেন!

ওর নরম গাল-দুটোর ওপরে টস-টস করে জল পড়ে। চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। অপমানে ও অভিমানে।

অভিমান মায়েরই ওপর। আর কার ওপরই বা অভিমান করতে পারে!

বাবা তো নেই। বাবা যে কোথায় কে জানে!

আশ্চর্য লাগে এই যে মায়ের মুখে ও বাবার কথা শোনে নি একদিনও। মায়ের মাথায় একটুখানি সিঁদুর দেখে সবাই বোঝে ওর বাবা বেঁচে আছেন।

কিন্তু কোথায় যে আছেন, কে জানে!

ও ছোটবেলায় দু'দিন মাত্র বাবার কথা জিজ্ঞেস করেছিল মাকে। আর কখনও জিজ্ঞেস করে নি। বলেছিল, বাবা কোথায় মা?

মায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে ভয়ানক হয়ে উঠেছিল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন—ও-কথা বলতে নেই।

আর কিছু বলে নি মায়া। মায়ের মুখটা দেখে ও বুঝেছিল যে ওই কথাটা আর জিজ্ঞেস করা যাবে না।

তবু আর একবার জিজ্ঞেস করেছিল। মাত্র কয়েক বছর আগে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করেছিল মায়া।

আবেগে মাকে এসে জড়িয়ে ধরেছিল।

মা গাম্ভীর্য যতটা সম্ভব বজায় রাখবার চেষ্টা করলেও একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন।

বললেন—তুই যতদূর পড়বি, তোকে আমি পড়াব। তোর মত মেয়ে কটা লোক পায়!

—কিন্তু মা—

বলতে গিয়ে থমকে গিয়েছিল মায়া।

—কী? সস্নেহে জিজ্ঞেস করেছিলেন মা।

—মনটা ভাল লাগছে না। মুখ ভার করে মায়া বলে।

—কেন রে?

—যে ক'টি মেয়ের বাড়ি গেলুম, সবাই বাবাকে প্রণাম করে মায়ের কাছে গেল।

মুহূর্তের ভেতরেই ম্লান হয়ে ওঠেন মা। চুপ করে স্তম্ভিত হয়ে কী যেন ভাবতে থাকেন।

—বাবার কি একটা ফোটোও নেই?

মা আরও একটু সময় কী ভাবেন, তারপর ধীরে ধীরে বলেন, না। নেই।

—বাবা কি বেঁচে আছেন মা?

—হুঁ। আর কখনও এ-সব কথা বলো না।

বলে মা চলে গিয়েছিলেন।

মায়া অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। কিছুই বোঝে নি, তবু এটুকু আভাস পেয়েছিল যে, এমন একটা গুরুতর কিছু আছে, যার জন্যে এ-সব কথা মা শুনতেও চান না।

কী এমন গুরুতর কিছু থাকতে পারে?

অদম্য কৌতূহল হয়েছিল ওর। ভেবেছিল মায়ের বাক্স আলমারি ঘেঁটে কিছু একটা চিহ্ন বার করবে। বাবার কি কোন চিহ্নই নেই? নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু অদম্য কৌতূহলকেও দমাতে হয়েছিল, তার কারণ মাকে ও ভীষণ ভয় করে।

ভালবাসার সঙ্গে ভয়টাও সঞ্চারিত হয়েছে ওর মনে ছোটবেলা থেকে।

ওর মায়ের মত গম্ভীর মা ও আর কারও দেখে নি।

ভয়ে ও আজ পর্যন্ত আর একটা কথাও বলে নি। তাতে ওর অসুবিধা কিছু হয় নি।

শুধু অসুবিধা হয়েছে বান্ধবীরা যখন জিজ্ঞেস করেছে—তোর বাবা কোথায় রে?

—বিলেত গিয়ে আর ফেরেন নি।

ও নিজের মনগড়া এই কথাটা সবাইকেই বলত।

সবচেয়ে আশ্চর্য যে কোন আত্মীয়স্বজনও ওদের বাড়ি আসত না। ওরাও কারও বাড়ি যেত না।

মা ভুলেও কখনও ওর কাছে কোন আত্মীয়ের নাম করেন নি।

মায়ের কাছে চিরকাল শুনেছে শুধু পার্টি আর কাজ। মিটিং আর ভোট।

একেবারে ভাল লাগে না মায়ার।

উনিশটা বছর মায়ের কোলে থেকেই কেটেছে। খুশিমত কিছুই করবার উপায় ওর ছিল না। আর ভাল লাগছে না।

ধীরে ধীরে ওর মনের কোথায় যেন একটা ছটফটানি অনুভব করছে।

ডানার ছটফটানি। ও ডানা মেলতে চায়।

একটু আকাশ চায়। একটু বাতাস চায়।

বাবা থাকলে নিশ্চয়ই ওর এমনটা হত না! নিশ্চয়ই না।

চোখের জল কখন শুকিয়ে গেছে মায়া টের পায় নি।

মায়ের ডাকে চমকে তাকায়।

কাজল বসুমল্লিক ঘরে ঢুকেছেন।

—খুকী!

মায়া তাকায়। কিন্তু কথা বলে না।

—তৈরী হয়ে নাও। আমার সঙ্গে পার্টির অফিসে যাবে। এখুনি।

কাজল ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

হাত পা অবশ লাগে। তবু মায়া ওঠে। মায়ের হুকুম অমান্য করা চলবে না। অমান্য করলে কী হবে, সে কথা ভাববার অবসরও আজ পর্যন্ত পায় নি। ওকে উঠতে হয়। হাত মুখ ধুতে হয়। চুলটা ঠিক করে মুখে পাউডার ঘষে নিষ্প্রভ চোখে লাগাতে হয় কাজলের ছোঁয়া। শাড়ি বদলাতে হয়। হাতে নিতে হয় ছোট থলেটা।

কাজল মায়ার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

কুঞ্চিত ভ্রূ নিয়ে ভাবছেন, এ ছাড়া আর হাতের সামনে কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি।

মায়াকে পার্টির কাজে লাগাতে হবে ধীরে ধীরে।

পড়া, বাজনা আর পার্টির কাজ তিনটে মিলিয়ে ওর সময়টুকু ভরিয়ে ফেলতে হবে, যাতে ও অন্য চিন্তা করবার একটু অবসরও না পায়।

অর্থহীন চিন্তাই মূর্খামির বীজ। ওর সময় হরণ করতে হবে। লাগাতে হবে সে সময়কে অন্য কাজে। ও যেন আর কোথাও যাবার সময় না পায়।

মায়া তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসে।

মেয়ের ডান হাতটি বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে কাজল বসুমল্লিক চললেন পার্টি অফিসে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পাশে ঘুমচ্ছে মায়া। মুখখানা আজ শুকিয়ে গেছে ওর। সস্নেহে মেয়ের মাথাটি ভাল করে বালিশের ওপর উঠিয়ে দেন কাজল।

আজ তো প্রথম। তাই হয়তো এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

পার্টির সবচেয়ে পড়ুয়া যে ছেলেটি, তার কাছে আজ মায়াকে রাজনীতি অর্থনীতির গোড়ার ব্যাপারগুলো শিখতে বলেছেন তিনি।

ছেলেটি বইয়ের পোকা। অর্থনীতির দুরূহ বইগুলো অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারে। নাম সমর রায়। সমরের কাছে মাস-ছয়েক পড়লে মায়ার মোটামুটি রাজনীতির জ্ঞান হয়ে যাবে।

তাছাড়া সমর নিশ্চয়ই ওকে যত্ন করে শেখাবে। ভালই শিখবে ওর কাছে।

তাঁর নিজেরই তো সমরের কাছে কত দুরূহ ব্যাখ্যা বুঝে নিতে হয়, তবু সমর তাঁকে বলে—আপনার এ-সবই জানা। তবু কেন যে আমার কাছ থেকে শুনতে চান?

অগাধ শ্রদ্ধা ওর কাজল বসুমল্লিকের ওপর।

বুদ্ধিতে, দীপ্তিতে, কথায়, গাম্ভীর্যে ও নাকি জীবনে এমন নারীর সংস্পর্শে আসে নি।

কে জানে! কেন যে এরা এত ভক্তি করে!

কাজল বসুমল্লিকের চোখে ঘুম নেই।

ঘুমন্ত মায়ার পাশ থেকে ধীরে ধীরে উঠে পড়েন। ঘুম তাঁর সহজে আসতে চায় না। মাঝে মাঝেই ঘুমের ওষুধ খেতে হয়।

আজ আর খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

উঠে গিয়ে বসেন জানালার ধারে। ঠাণ্ডা বাতাসে বেশ আরাম লাগে।

জানালার ধারে চুপ করে বসে থাকেন।

মায়ার দিকে চোখ পড়ে। মেয়েটা বড় ক্লান্ত হয়ে ঘুমচ্ছে। আজ কি তিনি একটু বেশী কঠোর হয়েছেন ওর ওপর ?

হয়তো হয়েছেন। ওকে জীবনে ভুল করতে তিনি দেবেন না।

তাঁর জীবনেও সতেরো বছর বয়েসে এমনি একটা ভুল হয়েছিল। যে ভুল আজ পর্যন্তও তিনি বোধ হয় শুধরে উঠতে পারেন নি।

কে জানে কবে এই কাজলের দাগ মুছবে!

সতেরো বছরে আয়নার দিকে দিনে অন্তত আটবার নিজেকে দেখতেন আর সগর্বে তাকিয়ে থাকতেন নিজের সর্বাঙ্গে ছড়ানো যৌবনের দিকে।

যৌবন তার রূপকে যে কতখানি আকর্ষণীয় করেছিল তা কি তিনি জানতেন না ?

মায়ার চেয়ে অনেক সুপুষ্ট অঙ্গকান্তি তিনি বয়ে বেড়াতেন সে সময়ে।

ঠিক এই সময়েই তাঁর জীবনে এল সেই মূর্খ ছেলেটা—অজয় তার নাম। এল এক অশুভ মূহুর্তে। বসন্তোৎসবের দিনে।

অশুভ বই কি! ওই দিনটাকে আজও বড় ভয় করেন কাজল।

শহরে রঙের ছড়াছড়ি হয় বসন্তোৎসবে। বাতাস রাঙা হয়ে ওঠে ফাগে। শাড়ির নানা রঙের মত মনের আনাচে-কানাচে রঙ ধরে।

বসন্তের দমকা হাওয়ায় হঠাৎ মনটা থেকে থেকে উধাও হয়। মনে হয়, কী যেন নেই। কী পেলে যেন ভরে ওঠা যায়।

ফাল্গুনের সন্ধ্যার বাতাসটা অঙ্গের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পিপাসা জাগায়। যৌবনের অপূর্ণ পিপাসা দু'গুণ হয়ে চঞ্চল করে তোলে মন।

কাজল বসুমল্লিকের বড় বড় দুটো চোখের মণি যেন দুটো কালো ভোমরার মত ছটফটিয়ে ওঠে। কী যেন খুঁজে বেড়ায়।

ষোলো বছরের নিটোল যৌবনে ওর এত তৃষ্ণা ছিল যে ভেবে এখন অবাক লাগে।

অজয় এল ওদের বাড়িতে, আর ওর বন্ধুরা।

তখন যে-বাড়িতে থাকত কাজলরা, সেই বাড়ির মালিকের ছেলে মদনলালের বন্ধু অজয়। ওর দাদারও বন্ধু।

এক দল ছেলে। সব আঠারো থেকে একুশ, বড় জোর বাইশ। চোখে-মুখে অর্থহীন আনন্দের আলো। আলো ঠিকরে পড়ছে যেন সাতখানা ঝকঝকে ইস্পাতের মত সাতটি ছেলের চোখে-মুখে।

ওরা বসল কাজলদের বারান্দায়।

বাজনা নিয়ে এল মদনলাল। তবলা হারমোনিয়াম।

ফাগ ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাতাসটা লাল করে ফেলল ওরা।

রঙে-ভেজা শাড়িটা গায়ে লেপটে সিঁড়ির থামে নিটোল থুতনিটি রেখে দাঁড়িয়ে ছিল কাজল। চোখ দুটো ঘুরছে শুধু কালো ভোমরার মত।

হারমোনিয়ামের সামনে বসল ছেলেটি। রোগা লম্বা, মুখখানাতে যেন পরাগ মাখানো। পদ্মপরাগে ভোমরা বসল। স্থির হল।

একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল কাজল ছেলেটার দিকে।

কেন যে তাকিয়ে ছিল আজও মনে পড়লে চোখ দুটো জ্বালা করে কাজল বসুমল্লিকের। কী বোকাই না ছিলেন তখন! মধুর পিপাসায় মত্ত হয়ে এমন করে যে ডুবে যেতে হবে কে জানত!

একবার মায়ার দিকে ফিরে তাকান। বিষাক্ত যৌবনে মায়ার অঙ্গের কান্তি দেখে ওঁর নিজের সেদিনের কথাই বার বার মনে পড়ছে।

ছেলেটি গান গাইল।

'আমারে বাঁধবি তোরা। সে বাঁধন কি তোদের আছে?'

এ-কথা আজও অস্বীকার করতে পারেন না কাজল যে রবি ঠাকুরের এ গানটি তেমন করে আর কখনও শোনেন নি।

নিস্তব্ধ রাত্রে আজও কানে আঘাত করে সেদিনের সেই সুরের ছোট ছোট ঢেউগুলো। সে সুর মনে প্রাণে কী মায়া যে ছড়াল!

তারপর গাইল, 'যামিনী না যেতে জাগালে না'।

আজ যামিনীতেও তার শান্ত কঠিন স্নায়ুগুলো যেন নরম হয়ে আসতে চায় আবেগে সেদিনের এই গান দুটোর সুরের কথা ভাবলে।

আরও দু-একটি ছেলে গাইল, বাজাল। কিন্তু ওই যে মমতাভরা চোখ দুটি নিয়ে লম্বা ছেলেটি গাইল, ওর মত গান আর জীবনেও শুনতে পেল না কাজল।

কাজল ডাকল ওর দাদাকে ইশারা করে।

ওর দাদা একটু বিরক্ত হল, তবু কাছে এল।

বললে কাজল, বল না দাদা, এই গানটা উনি যদি আমায় তুলে দেন।

—কোন্ গান? বললে ওর দাদা।

—ওই যে রবি ঠাকুরের। 'আমারে বাঁধবি তোরা—'

—বললেই বা শেখাবে কেন? ও ছেলেটি কি সোজা! অজয় রায়। ও অদ্ভুত লেখে, অপূর্ব ছবি আঁকে, আর গান তো শুনলি।

—তবু একবার বল না।

—দেখি বলে।

ওর দাদা অনুরোধ করতে গেল অজয়কে।

অজয় রায়। ভাবতে কাজলের ছোট্ট বুকখানা যে কেমন করে ওঠে, ভাল ছবি আঁকে, সুন্দর গল্প লেখে। আর গানের তুলনা নেই।

কাজল স্থির হয়ে গেছে। ভোমরা-কালো চোখ স্তব্ধ হয়ে গেছে আবিষ্কারের আনন্দে।

কাজল এতদিন ধরে যাকে খুঁজেছিল, তাকেই যেন আজ পেয়েছে।

মৃদু কলরব তুলে বাতাস রাঙিয়ে দিয়ে চলে গেল ছেলের দল।

ওর দাদা বললে, আসবে। বিকেলে আসবে আজ। গানটা শিখে নিস্।

মদনলাল সায় দিলে, আমার বাড়ি কি না এসে পারে! ও যে আমার বেস্ট ফ্রেণ্ড।

কাজলের বুকটা ধুকধুক করে। ভয়ে আর আনন্দে।

আজ বিকেলে আসবে! বিকেল হতে আর কতক্ষণ বাকি?

সমস্ত দিনটা ছটফট করে কাজল। দুটো যদি বা বাজল তিনটে আর বাজে না। কী যে করবে ও? অকারণেই একখানা শাড়ি ভিজিয়ে ছাদে মেলতে যায়।

ছাদে এসে শাড়ি মেলতে গিয়ে চোখটা আপনা থেকেই যায় রাস্তার দিকে।

রাস্তাটা ফাঁকা। এ-গলিতে তো একটা লোকও দেখা যায় না।

বিকেল বলে কি আড়াইটেয় আসতে নেই। আড়াইটে বাজলে বিকেলের আর কি-ই বা বাকি থাকে? এক ঝলক বাতাস এসে ওর সাবান-ঘষা চুলের গোছা উড়িয়ে নেয়।

আবার মন উধাও। মনের খোঁজ মেলে না। থমকে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। কী যে ভাবে ঠিক নেই কিছু। ভাবের বেগে ভাবনা ভুল হয়ে যায় বারে বারে। আবার নীচে নেমে আসে। কান সদরের দিকে।

আসে কিন্তু ছেলেটা। না এসে কি পারে! তার নীরব দৃষ্টি বৃথা যায় নি। মৃদু হাসি অনর্থক হয় নি। শুনতে পায় ডাকছে।

—মদনলাল আছ?

কাজলের দাদা এগিয়ে যায়। ওকে ডেকে ভেতরে নিয়ে আসে।

কাজল কলঘরে ঢোকে। হাতমুখ পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে। ইচ্ছে করেই দেরি করে।

দাদা তাগাদা করে।

—কই রে, হল? বসে আছে যে?

একটু পরে বেরোয়। যেন কত বিরক্ত হয়ে বলে, দাঁড়াও, বাব্বা! তোমাদের তাগাদায়—

পরিষ্কার শাড়িটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। একটু পাউডারের প্রলেপ, একটু কাজল চোখের কোণে। ঠোঁটটা তুবার ভাল করে দাঁতে চাপলেই টুকটুকে লাল হয়ে ওঠে ঠোঁট ছুটি।

বাইরের ঘরে এসে দেখে অজয় বসে আছে। মুখটা নিচু করে বসে আছে।

ওর দাদাও সঙ্গে সঙ্গে আসে। মদনলালও।

গান আরম্ভ হয়। প্রথমে আর একবার সবটা গান গেয়ে নেয় অজয়। মিষ্টি সুরে রোমাঞ্চিত হয় কাজল। তাকায় ওর দিকে। ও আবার গল্পও লেখে! ছবিও আঁকে!

—এইবার তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও।

বললে অজয়। কথা ক'টি যেন গানের মতই মধুর।

গাইতে শুরু করল অজয়। কাজল চুপ।

—কী হল, আমার সঙ্গে গলা দাও।

কাজল একটু হেসে বলে, আপনি আর একবার গান।

—বেশ। গান ধরে আবার অজয়।

এই সময়ে মদনলাল ওর দাদাকে নিয়ে চলে যায় বাইরে গল্প করতে করতে।

গান শেষ করে বলে অজয়, এবার তুমি বাজাও।

হারমোনিয়ামে আঙুল টিপে টিপে দেখিয়ে দেয়।

—এই তো, আমারে বাঁধবি তোরা, সে বাঁধন কি তোদের আছে—এ-এ-এ-এ।

কাজল এবার গান ধরে।

প্রথম তু-লাইন গাইবার পর অজয় হাঁ করে ওর দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে ফেলে, বাঃ! কী সুন্দর গলা!

কাজলের কান দুটো রাঙা হয়ে ওঠে। একটা কথাও বলতে পারে না।

গান চলতে থাকে।

—উহুঁ—হুঁ—ভুল হল।

অজয় ঝুঁকে পড়ে হারমোনিয়ামের দিকে। ওর কাঁধটা নিতান্ত অসাবধানেই কাজলের গলার নীচে ধাক্কা খায়।

মুহূর্তে একটু সরে বসলেও আর একবার আরক্তিম হয়ে ওঠে কাজল।

অজয় একটু অপ্রস্তুতে পড়লেও তখুনি সামলে নেয়।

ইচ্ছে করেই কি ধাক্কা দিয়েছে অজয় ? ঠিক বোঝা গেল না।

কিছুক্ষণের ভেতর গানের প্রায় অর্ধেকটা শেখা হয়ে যায়।

—এত তাড়াতাড়ি শিখে ফেলছ ! আমার মাস্টারি তো দু'দিনও টিকবে না।

কাজল হেসে বলে, কেন, আরও গান শেখাবেন।

—কেন শেখাব ? বদলে কী পাব ?

কাজল চোখ দুটো নিচু করে, বাঃ রে, আপনিই তো বললেন।

অজয় হাসে, তুমি কি আগে গান শিখতে ?

—না।

—তবে এমন সুরবোধ এল কী করে ?

– কী করে জানব ? হেসে ফেলে কাজল।

অজয় চুপ করে কী ভাবে।

—কই, তারপরের লাইন বলুন ?

অজয় যেন শুনেও শোনে না। ইচ্ছে করেই কি শোনে না ? কে জানে ?

—কই, কী ভাবছেন ?

—কিছু না তো।

আবার দু-লাইন গান হয়।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়। খোলা জানালা দিয়ে দিনের

শেষ চিহ্ন মুছে যাচ্ছে আকাশে, বেশ দেখা যায়। কেমন একটা নেশা-মাখানো বাতাস বইছে। জানালা দিয়ে বাতাস এসে নেশা ধরিয়ে দিয়ে যায়।

অজয় আবার যেন কী ভাবছে!

কাজল তাকায়। আধো-অন্ধকারে অজয়ের লম্বা শরীরটি ওর চোখে ছায়া-ছায়া মনে হয়।

—কী ভাবছেন? খুব আস্তে বলে কাজল।

অজয় তবু ভাবছে।

—কী ভাবছেন বলুন তো?

অজয় তাকায়।

আর এক ঝলক বাতাস ঢোকে ঘরে।

যেন নেশার ঘোর লেগে যায়।

তেমনি আস্তে আস্তে বলে, সে কথা শুনলে তুমি রাগ করবে।

—আমি? পাখির মত নরম বুকটা কেঁপে ওঠে কাজলের। —আমি রাগ করতে যাব কেন? কী ভাবছেন বলুন না?

অজয় ফিসফিস করে বলে ফেলে, যদি বলি তোমাকেই ভাবছিলাম।

মুহূর্তে আরও একবার রক্তিম হয়ে ওঠে কাজলের মুখখানা।

মুখটা নিচু করে ফেলে।

অজয় উঠে দাঁড়িয়েছে—আচ্ছা, আজ চলি। আবার কাল আসব।

অজয়ের বেরিয়ে যাবার পায়ের শব্দটা শুধু শুনতে পায় কাজল। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে ও।

আনন্দে আর ভয়ে অভিভূত হয়ে বসে থাকে।

ঘরটা যে কখন অন্ধকার হয়ে গেছে খেয়াল নেই।

হাসিই পায় আজ ভাবলে। কাজল বসুমল্লিক জেগে বসে আছেন জানালার ধারে। ভাবতে ভাবতে যেন জ্বালায় অস্থির হয়ে ওঠেন। তখুনি যদি ছেলেটাকে একটা চড় বসিয়ে দিতেন, তবেই হয়তো বোকা ছেলেটার উপযুক্ত শাস্তি হত।

তখন তো এত কঠোর হতে পারেন নি। প্রথম রাতটা অজয়ের কথা ভাবতে ভাবতেই কেটে গেছে প্রায়। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হয় নি। অনেক রাত পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি ছেলেটির মৃদু হাসি আর উদাস দুটো বড় বড় চোখের দৃষ্টি।

মনটা যেন গলে গেছে ওই মুখখানির ওপর এক অভাবনীয় মমতায়। এত মমতা কেন যে হঠাৎ এল আজও ভেবে উঠতে পারেন না কাজল বসুমল্লিক।

মমতার আকর্ষণটাই বড় ছিল প্রথম প্রথম। দেখলে কেমন মায়া হত। বড় নরম মন ছিল কাজলের। সেই মমতাই যে ক্রমে সুতীব্র ভালবাসার রূপ নেবে কে জানত!

মেয়েদের ভালবাসায় বোধ করি মমতার ভাগই বারো আনা। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এ-কথা বুঝেছে কাজল। জ্বলে বুঝেছে।

এর পরেও এসেছিল অজয়। পরদিন আসে নি।

পরদিন বিকেলে কিসের একটা টানে বারে বারে দরজার কাছে দাঁড়াচ্ছিল কাজল। অজয়ের আসবার আশায় এতে সন্দেহ নেই, তবু এ-কথাটা নিজের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছিল।

অজয় এল। দু'দিন পরে।

কাজল দেখল। মুখের উপর একটু বিরক্তির ভাব আনল। হাসল না।

অজয় লক্ষ্য করল। মুখটা ওর মুহূর্তে শুকিয়ে গেল।

আবার মমতায় ভরে উঠল কাজলের মন।

মদনলালের সঙ্গে আর দাদার সঙ্গে গল্প করছিল অজয়।

কাজল ঘরে ঢুকল।

অজয় তাকাল। একটু হাসল।

কাজল মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে একটা চেয়ারে বসল। খাতা পেন্সিল নিয়ে কী লিখতে লাগল। কিছুই লেখা হল না। বার বার একটা কথা মনে করে হাতের কলম থেমে যাচ্ছিল। যদি বলি তোমাকে ভাবছিলাম। কথাটা কিন্তু ভারি মিষ্টি। অদ্ভুত! কাজলকে যে কেউ একান্ত করে ভাবতে পারে, এই প্রথম শুনল। ওর ষোলো-বছুরে কাঁচা যৌবন কেঁপে উঠল। এই নতুন যৌবনের কথা একজন নিজের করে ভাবতে পারে, গভীর করে ভাবতে পারে! অবাক আনন্দে ভরে ওঠে কাজল।

হঠাৎ অজয় ওর দিকে তাকিয়ে বললে, কই, আজ আর শিখবে না?

মুখটা খুব গম্ভীর করে কাজল বললে, না।

অজয়ের মুখখানা কালো হয়ে গেল। মদনলাল একটু হেসে ওর দাদার সঙ্গে গল্প করতে করতে বাইরে চলে গেল।

এতে একটু অবাক হয়েছিল কাজল। কিন্তু পরে শুনেছিল মদনলাল অজয়ের কথা সব জানত। অজয়কে তার সান্নিধ্যে আসবার সুবিধে করে দেবার জন্যেই দাদাকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। অজয় এসে ওর পাশের চেয়ারটায় বসল। চুপ করে বসে রইল। কথা বলতে যেন ভয় পাচ্ছিল।

কাজলও মুখটা গম্ভীর করে বসে রইল।

চুপচাপ কাটছিল সময়। একা একা। খুব মূল্যবান সময়। তবু কেউ কথা বলতে পাচ্ছিল না। একটু পরে মদনলাল ওর দাদাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

কাজল ওদের দেখে একটু হেসে বললে অজয়কে, 'কই, গানটা লিখে দিন?

অজয় অবাক। হয়তো ভাবল মেয়েদের কিছুই বোঝবার জো নেই। বললে, কোন্ গানটা?

কাজল একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠল—কী বোকা আপনি! যে গানটা শেখাচ্ছিলেন।

—অ! গম্ভীর হয়ে অজয় বললে, কাগজ পেন্সিল দাও।

কাগজ পেন্সিল এগিয়ে দিল কাজল।

অনেকক্ষণ লিখে অজয় ওর হাতে কাগজখানা দিল।

পড়ে কাজল আর একবার রাঙা হয়ে উঠল। কী দুঃসাহস ছেলেটার! দাদার সামনে একথা লিখতে পারল? ভয় ওর নেই, না বোকা?

অজয় অনেক কাটাকুটি করে লিখেছে—

'বিশ্বাস কর, প্রথম দেখেই তোমাকে ভাল লেগেছে। তোমার মনের কথা জানতে চাই। লিখে জানাও।'

কী সাহস! স্তম্ভিত হয়ে যায় কাজল। লজ্জায় ভয়ে জড়সড় হয়ে চেয়ারে বসে থাকে।

মেঝেতে ততক্ষণে মদনলাল আর ওর দাদা ক্যারম খেলতে বসে গেছে।

কাজল ঘামতে থাকে। নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়।

অজয় ওর কাছ থেকে কাগজটা পাবার আশায়, ওর লেখা পাবার আশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপর যেন অস্থির হয়ে ওঠে। মাথাটা টিপে বসে থাকে।

কাজল কাগজটা মুড়ে ওদের সকলের অলক্ষ্যে ওর ব্লাউজের ভেতর পুরে ফেলে।

অজয় অস্থির হয়ে ওঠে আরও।

চোখের ইশারায় কাজলকে কিছু লিখতে বলে।

কাজল যেমন ভয় পায়, তেমনি মায়াও হয় ওর জন্যে। ওর ছটফটানি আর বোকামি দেখলে কষ্ট হয়। অজয় বরাবরই ভাবাবেগে ভেসে যাওয়া মানুষ।

তাই হয়তো এত আবেগ ওর সুরে, গানে।

কপাল ধরে মুখটা নিচু করে বসে থাকে অজয়।

কাজল লেখে, আপনি যা ভেবেছেন তা সত্যি। আপনাকে আমার কী যে ভাল লেগেছে!

ব্যস্‌। আর লিখতে পারে না।

কাগজটা কি এগিয়ে দেবে ওর দিকে? বার বার ভাবে কাজল। তবু অজয়ের কাছে দিতে পারে না। কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে।

অজয় দেখে। চোখ বড় বড় করে দেখে।

টুকরো-টুকরো করে জানলা দিয়ে ফেলে দেয় কাজল।

তারপর আর কোনদিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রান্নাঘরে মায়ের কাছে গিয়ে ঘণ্টাখানেক বসে থাকে। চুপ করে বসে থাকে। ও ভাল করল কি খারাপ করল কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

ও জানে হয়তো অজয় আর কোনদিন আসবে না। তবু কেন যে কাগজের লেখাটুকু ও অজয়ের হাতে দিতে পারল না, ও বুঝে উঠতে পারে না।

ঘণ্টাখানেক পরে ম্লান মুখে ওই ঘরের দিকেই যায় কাজল।

ঘরটা ফাঁকা। ওরা সবাই চলে গেছে।

চুপ করে চেয়ারটায় বসে। ব্লাউজের ভেতর থেকে অজয়ের হাতের লেখাটুকু বার করে বার বার পড়ে ওই একটি মাত্র লাইন।

হয়তো আর আসবে না অজয়। এইটুকুই একমাত্র চিহ্ন রেখে গেল। একদিনের ভালবাসার কাহিনী।

একটা নিশ্বাস ফেলে চেয়ার থেকে উঠে জানলার ধারে যায়।

হঠাৎ চোখে পড়ে, কাগজের টুকরোগুলো নেই। তার লেখা কাগজের টুকরোর একটাও সেখানে পড়ে নেই। ভয়ে বুকটা কেঁপে ওঠে। ওটা দাদার হাতে পড়ল না তো?

কী হল টুকরোগুলো?

জানতে পারল পরদিন। অজয় এল দুপুরবেলা মদনলালের সঙ্গে। মদনলাল কাজলের দিকে তাকিয়ে ওর দাদাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল কথা বলতে বলতে। কাজল বেরতে যাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে। পেছনে একটা টান পড়ল আঁচলে। কী অসভ্যের মত সাহস।

পিছন ফিরে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। অজয় হাসছে।

—দাঁড়াও।

ততক্ষণ দাদা আর মদনলাল চলে গেছে।

কাজল তেমনি ভ্রূ কুঁচকে ঃ কেন ?

টুকরো কাগজগুলো আঠা দিয়ে জোড়া, পকেট থেকে বার করে অজয় বলে, উত্তর তো আমি কালই পেয়ে গেছি।

খুশিতে মন ভরে উঠলেও মুখে বিরক্তি বজায় রেখেই বলে কাজল, তা কী হয়েছে ?

অজয় একটা চেয়ারে বসে বলে, বস।

—না।

—কোথায় যাবে। বস, দুটো কথা আছে।

—না। কোন কথা নেই।

বলে কাজল চলে যেতে চায়। অজয় একটা হাত চেপে ধরে খপ করে।

বন্যের মত দুঃসাহস অজয়ের। আবেগে ক্ষেপে যায় যেন।

—কি হচ্ছে, মা আছেন।

অজয় হাতটা ছেড়ে দেয়, কোথায় ?

—পাশের ঘরে।

অজয় এবার খুব মিষ্টি করে বলে, একটু বস। একটুখানি।

ওর মুখের ভাবভঙ্গি দেখে কাজলের মায়া লাগে। ও বসে।

অজয় আনন্দে যেন উপচে পড়ে, আমি কি পেলাম, কি বলব তোমায়।

—তারপর ? মুখ টিপে হাসে কাজল।

—তোমাকে দোলের দিন যখন প্রথম দেখি—

—তারপর ?

অজয় ওর দিকে তাকিয়ে বলে, এবার তুমি বল—।

কাজল হেসে ফেলে—আমি আবার কী বলব ?

অজয় কাছে এগোতে চায়।

—উঁহুঁ-হুঁ।

অজয় থমকে যায়।

দুজনের কাছে দুজন যেন কত পরিচিত হয়ে গেছে। দুজনেই ধরা পড়ে গেছে। দুজনকেই দুজন অনেকটা চিনে ফেলেছে।

—মনে হচ্ছে কি জান? অজয় বলে।

—কী?

—তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে কথা বলি।

—হুঁ।

—আর তোমাকে অনেকক্ষণ বসে বসে দেখি।

—হুঁ। তারপর। কথা শেষ হয়েছে? এবার যাই। মা জাগলে—।

—আর রক্ষে নেই। তবে আজ বরং যাই।

কাজল তাকায়। ওরও কি ইচ্ছে হয় অজয় এখনি চলে যাক? ওরও কি ইচ্ছে হয় না অজয়কে অনেক সময় বসে দেখে? কিন্তু মুখে নয়, ভাবে নয়, কিছুতেই কেন যে প্রকাশ করতে পারে না।

—কবে আসবেন?

—যেদিন বলবে। হাসে অজয়।

—পায়ের শব্দ পাচ্ছি—! বলেই মুহূর্তে কাজল ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সত্যিই একটু পরেই মদনলাল আর কাজলের দাদা ঘবে ঢোকে।

কাজল পাশের ঘরের দরজাব আড়াল থেকে শোনে মদনলাল বলছে, অজয় আর তোমার দুজনেরই তো বাংলা অনার্স। দুজন একসঙ্গে পড়তে পার।

অজয় বললে, তবে তো ভালই হয়।

—তবে কাল বই নিয়ে দুপুরে এস। দাদা বললে।

অজয় বললে, হ্যাঁ। আসব। দুজন একসঙ্গে পড়া যাবে। আজ যাই।

ওদের পায়ের শব্দ পায় কাজল। ওরা সবাই বোধ হয় বেরিয়ে গেল। তবু দোরটা খুলতে সাহস হয় না। আস্তে আস্তে গিয়ে মায়ের পাশে শুয়ে পড়ে।

কাল থেকে রোজ আসবে অজয়। রোজ দুপুরে। কাজল স্কুলে যাবে। এবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে সে।

তা হোক। স্কুল থেকে না হয় দু-এক ঘণ্টা আগে চলে আসবে।

রোজ আসবে। ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চ হয় কাজলের। এক অনাস্বাদিত আনন্দে বুকের ভেতরটা কেমন ধুকধুক করে। জোরে নিশ্বাস নিতে হয়।

এরপর রোজই আসত অজয়। কাজলের দাদার সঙ্গে বসে একসঙ্গে পড়ত। কাজল পাশের ঘর থেকে লক্ষ্য করত। পড়তে পড়তে বার বার তাকাত দরজার দিকে। যদি একবার কাজলকে দেখা যায়। কাজল ইচ্ছে করেই দরজার কাছে একবারও যেত না। কিন্তু সিঁড়ির পাশে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত অজয়কে। দেখে যে আশা মেটে না, এ ভাবটা কাজল উপলব্ধি করল। প্রেমের রীতি কি চিরদিনই এক।

নির্নিমেষ চোখ মেলে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকত।

সিঁড়িতে মদনলালের পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে উঠত।

মদনলাল মুচকি হেসে ওর গা ঘেঁষেই চলে যেত।

মদনলালের এই হাসিটা ওর ভাল লাগত না। কেমন ভয়-ভয় করত। কি একটা গোপন ভাব যেন প্রকাশ পেত মদনলালের হাসিতে, যা কাজলের মনকে আতঙ্কিত করে তুলত।

ভাবত এ হয়তো ওর অহেতুক ভয়।

অজয়ের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ বড় একটা হত না।

ও মাকে দিয়ে ওর দাদাকে ইচ্ছে করে এটা-ওটা আনতে দোকানে পাঠাত। সেই সময় এক গেলাস জল নিয়ে যেত ঘরে।

—নাও জল খাও।

অজয় চমকে তাকিয়ে হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে বলত, জল তেষ্টা পেয়েছিল বটে। কি করে বুঝলে ?

—তেষ্টা নিয়েই তো আস। এটা আবার বুঝতে হয় নাকি ?

অজয় খুব হাসত।

—আর একটা তেষ্টা পাচ্ছে।

—দুষ্টুমি করো না। জল খাও।

অজয় জল খেয়ে বলে, রোজ জল নিয়েই বা আস কেন?

—এমনি এমনি কি আসা যায়। মা কী ভাববে। তুমি যে কি বোকা।

—ভাবে ভাবুক না।

—কী বুদ্ধি! কি করে যে বি-এ পড়ছ জানি নে।

অজয় এগিয়ে আসে।

—থাক, এগোতে হবে না। আচ্ছা, মদনদা কি সব জানে?

—সব। ও-ই তো আমায় সুযোগ করে দেয়। আমায় বড় ভালবাসে।

কাজলের মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। কথা বলে না।

অজয় বলে, ওর কথা সব বলব'খন। এখন শুনবে?

—না। দাদা এসে পড়বে। নাও এই চিঠিটা। উত্তর যেন পাই।

কাজল ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অজয় চিঠিটা কোঁচার খুটে বেঁধে ফেলে। পকেটে রাখতেও ভরসা হয় না।

একটু পরেই কাজলের দাদা এসে পড়ে। সঙ্গে মদনলাল।

আজ মদনলাল অজয়কে দেখে নি, তাই একটু হেসে বলে, কখন এলি?

—এই তো কিছুক্ষণ আগে।

কাজলের দাদা সতরঞ্জিটায় বই নিয়ে বসে পড়ে, আজ কি রচনা কিছু লিখবে?

অজয় মাথাটায় হাত রেখে বলে, আজ থাক ভাই। ভাল লাগছে না।

কাজলের দাদা হাসে, তুমি কিন্তু বড্ড কম পড়।

—কি জান, ঠিক পরীক্ষার আগে আমি খুব পড়ি। আগে থেকে পড়তে ভাল লাগে না আমার।

মদনলাল বলে, হুঁ তার চেয়ে বরং চল কোন সিনেমায় যাই।

—সিনেমায় ?—কাজলের দাদা বলে, আমি যাব না।

—কেন ? ও আবার বড্ড ভাল ছেলে কিনা। মুখ টিপে হাসে মদনলাল।

অজয় হাসে, তবে তুমি রচনা লিখো। আমি বরং কাল লিখে এনে তোমার সঙ্গে মিলিয়ে নেব।

—চ' মদন। একটা সিনেমায় যাওয়া যাক।

মদন আর অজয় উঠে পড়ে। রাস্তায় বেরিয়ে আসে।

হাঁটতে হাঁটতে বলে মদন,—আজ কিছু বললে ?

অজয় অন্যমনস্ক ছিল। বলে, কে ?

—কাজল ?

—অ ! হ্যাঁ। চিঠি দিলে।

মদনের চোখ ছুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, চিঠি ? দেখি।

নির্জন রাস্তায় চলতে চলতে একটা বড় বাড়ির রোয়াকের কাছে এসে বসে পড়ে অজয়, বস।

মদন বসে।

অজয় চিঠিটা বার করে কোঁচার খুঁট থেকে। ধীরে ধীরে বার করতে ওর বুকটা কাঁপে। কী জানি কী লিখেছে আজ! রোজই নতুন খবর, নতুন কথা। নতুন করে বলা একই ভালবাসার কথা। তবু বুকটার ভেতর কেমন করে ওঠে।

অজয় চিঠিটা খোলে।

"কাল থেকে কেমন ভয় ভয় করছে। তোমাকে যে কত কথা বলবার আছে ভাবতে ভাবতে সব গুলিয়ে যায়। একটি কথা না বললেই নয়।"

কী কথা, অজয়ের বুকটা ধুক ধুক করে পড়তে পড়তে।

মদনলাল একবার চিঠিটার দিকে উঁকি দিতে চায়। স্বাদ গ্রহণ করতে চায়। প্রেমের স্বাদ। অজয়ের আর কাজলের প্রেমের স্বাদের একটু ভাগ চায়। চোখ ছুটোয় ভিখিরীর মত লোভ।

অজয় একটু সরে বসে। ওকে দেখতে দেয় না। এ চিঠি তার একান্ত আপন। এ চিঠির পুরো স্বাদ সে ভোগ করবে আগে। তার-পর উচ্ছিষ্ট যদি কিছু থাকে, মদনলালকে দিতে আপত্তি নেই।

মদনলাল চুপ করে বসে পা নাচায়।

অজয় পড়তে থাকে।

"তোমাকে হারাবার ভয় আমায় যেন পেয়ে বসেছে। তুমি তো জান না, তুমি আমার কত কাছের মানুষ। তুমি জীবনে প্রথম পুরুষ, বোধহয় শেষ পুরুষ।

তোমার কাছে নিজেকে এমন করে বিলিয়ে দিয়েছি যে আর কোন পুরুষের কথা ভাবতেও পারি নে। কিন্তু কয়েকদিন ধরে মদন-দার ভাব-সাব আমার মোটেই ভাল লাগছে না। একদম নয়। ও যেন কী একটা চায়। কী যে চায় আমি বলে বোঝাতে পারব না।

মদনদা সব কথাই জানে। ওইটেই বোধহয় সবচেয়ে ভয়ের কথা। প্রথম থেকেই ওকে কিছু না জানালেই ভাল হত। কেন যে সব জানালে ?

তবু আর কিছু জানিও না। যতটুকু জেনেছে ততটুকু ও যত শীঘ্র ভুলে যায় ততই মঙ্গল।

ছাতে কাপড় মেলতে এসে তাড়াতাড়ি লিখছি। মা ডাকছে। এখুনি ছাত থেকে নামতে হবে। আজ এখানেই শেষ রইল। কাল চিঠির উত্তর চাই। চিঠিতে আর কী দেবো। যা ইচ্ছে হয় নিও। কাজল।"

অজয় চিঠিটা পড়া শেষ করে চুপ করে বসে থাকে। ভয়ে ভয়ে তাকায় ও মদনলালের দিকে।

মদনলাল পা নাচাতে নাচাতেই বলে, কী রে ? কী লিখেছে ?

অজয় চুপ করে থাকে।

—কী হল রে ?

অজয় কি বলবে মদনকে ভেবে ঠিক করতে পারে না। চিঠিটা মুঠোয় চেপে কি ছুটে পালাবে ? ঘেমে ওঠে অজয়।

পা নাচান বন্ধ করে মদন বলে, কী রে, অমন গোমড়া মুখ করে বসে রইলি কেন ?

অজয় তবু কথা বলে না। হাতের মুঠোর ঘামে চিঠিটা ভিজে ওঠে।

মদন হাত বাড়ায়, দেখি চিঠিটা ?

অজয় ঝোঁকের ওপর বলে ফেলে, সব চিঠিই কি তোকে দেখাতে হবে ?

—মানে ? মদন চোখ গোল গোল করে।

—এ চিঠি আমি দেখাতে পারব না।

মদন বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে বলে, কেন ?

—না। দেখাতে পারব না।

মদনের মুখটা অপমানে কালো হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে।

দুপুরের চড়া রোদটা ততক্ষণে এসে পড়েছে রোয়াকের ওপর। কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। কারও মুখে কথা নেই। দুজনেই বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকে চুপ করে।

মদন এতক্ষণে একটা নিশ্বাস ফেলে কঠিন স্বরেই বলে, ভুলে যাস নি এ চিঠি তুই আজ আমার জন্যেই পেয়েছিস।

—মানে ?

—মানে আমি সুযোগ করে না দিলে কাজলকে কি কোনদিন তুই পেতিস ?

অজয়ও রাঙা হয়ে ওঠে, সে কথা জোর করে কিছু বলা যায় না।

—বলা যায়। আমিই প্রথম তোকে আমাদের বাড়িতে এনেছিলাম।

—জানি।

—আমার তৈরী জিনিস তোর মুখে তুলে দিয়েছি।

অজয়ের ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে, তোর তৈরী মানে ?

—হ্যাঁ, আমারই তৈরী। আমিই প্রথম প্রথম ওকে প্রেমের ধারণা করিয়েছিলাম।

—ধারণা কি রকম ?

—ধারণা মানে, আমি মুখ্খু মানুষ, তোকে হয়ত ঠিক বুঝিয়ে বলতে পাচ্ছি নে। মানে ওকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে নানা কথায়-বার্তায় পুরুষ মানুষের যে ওর ওপর লোভ হতে পারে এই ধারণাটা করিয়েছিলাম। তারপর—।

অজয় চুপ করে থাকে।

—তারপর তোকে এনে জুটিয়ে দিলাম। আজ আমাকে লুকিয়ে কোন লাভ হবে না। তোদের ভালবাসা আমারই তৈরী। আমাকে লুকতে পারবি না। কখনই না।

মদনলাল চটিটা পড়ে উঠে পড়ে।

অজয় ওর হাত ধবে বসায় ভয়ে ভয়ে, রাগ করিস নি ভাই।

মদন চুপ করে দাঁড়ায়।

—এ চিঠিটা ছাড়া আর সবই তো তুই জানিস। এটা দেখতে চাস নি ভাই। কাজলকে তোর জন্যই পেয়েছি স্বীকার করছি। তুই রাগ করলে কে আর আমার সহায় হবে।

মদনলাল হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চটির শব্দ করতে করতে চলে যায়।

প্রখর রৌদ্রের তেজে অজয়ের মাথাটা দিয়ে আগুন বেরোয় যেন। ও তেমনি চুপ করে বসে থাকে রোয়াকে। একবার ভাবে, এখনই কাজলদের বাড়ি যাবে। আবার ভাবে, তা হলে ওর দাদা কি মনে করবে। তাছাড়া মদনলালই বা কী ভাববে।

ভাবুকগে। যেতেই হবে তাকে। এখনি।

বিকেল হয়ে এসেছে তখন। অজয় উঠে পড়ে। কাজলদের বাড়ির দিকেই এগোয়। দ্রুত পা চালিয়ে এগোয়। গলিটার সামনে এসে একবার ভাবে ঢুকবে কিনা। আবার ভাবে ফিরে গেলেও হয়।

হঠাৎ গায়ে একটা টুকরো ঢিল লাগে।

কে মারলে ? ওপরে তাকিয়ে দেখে কাজল ছাদের আলসের ওপর দাঁড়িয়ে হাসছে।

ও এগোয়। বাড়ির ভেতর ঢুকে সোজা তরতর করে ছাতে উঠে যায়। যা বরাতে থাকে তাই হবে। তবু আজই সব কথা বলতে হবে কাজলকে।

ছাতে এসে কাজলের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে।

—কী হল, অমন হাঁপাচ্ছ কেন ?

—মদন আছে ?

—না।

—তোমার দাদা বাড়ি আছে ?

–না।

ঈশ্বরকে অজস্র ধন্যবাদ জানায় অজয়।

কাজল ওর চোখমুখের অবস্থা দেখে বলে, কী ব্যাপার বল তো ? মুখখানা এমন হয়েছে কেন ?

—সর্বনাশ হয়েছে।

—কী সর্বনাশ হোল ?

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব কথা অজয়ের কাছ থেকে কাজল শোনে। শুনে গম্ভীর হয়ে যায়। কী বলবে আর কী করা যাবে কিছু ভেবে পায় না।

তবু ও অজয়ের জামার বোতামটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, ভয় কি ! সব ঠিক হয়ে যাবে।

—তুমি বলছ সব ঠিক হয়ে যাবে ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমি বলছি। কাজল হাসবার চেষ্টা করে। বলে, এর পর থেকে চিঠিপত্তরের কথা কিছুই বলো না ওকে। বন্ধুর মত কথা বলো। যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে। বুঝলে ?

অজয় ওর কোমরটা ধরতে যায়।

সরে যায় কাজল,—এই, অমনি ছেলেমানুষি আরম্ভ হলো। খোলা ছাদে একটু ভয় ডরও নেই।

—তুমি তো সব ভয় কাটিয়ে দাও।

—তবে আমি যা বলি তাই কর।

—কি ?

—কাল থেকে কয়েকদিন আমার দিকে তাকাবে না। আমার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করবে না। শুধু মদনদার সঙ্গে কথা বলবে। যত পার। বুঝলে ?

—বুঝেছি। কিন্তু পারব কি ?

—না পারলে বকুনি খাবে।

—কার ?

—কার আবার। আমার।

—বকুনি খেতে যদি খুব ইচ্ছে করে ?

—তবে রাগ করব।

—রাগ করতে তুমি পারবে না।

—খুব পারব। এত জ্বালাচ্ছ আমায় আর রাগ করতে পারব না !

কাজল হাসতে থাকে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুব ভাবিত হয়ে পড়ে। মদনলালকে ঠাণ্ডা করতে একমাত্র সেই পারবে। এ কথা সে জানে। কিন্তু মদনলালকে ভয়ও করে তার সব চেয়ে বেশী।

হঠাৎ কাজল বলে, ওই কথাটা কী বললে তখন ? মদনদা বলেছে, ও আমায় প্রেমের ধারণা করিয়েছে ? ভারি মজার কথা বলেছে।

অজয় বলে, কিন্তু ও তো খুব জোর দিয়েই বললো কথাটা।

কাজল হাসে, সোজা কথাটা কি জান ?

—কী ?

—বছর খানেক ধরে ও আমার পেছনে একটু লেগেছিল।

—তাই নাকি ?

—নানা ভাব ভঙ্গীতে তাই বুঝতাম, আর মনে মনে হাসতাম।

—তারপর ?

—তারপর আর কী ? এক পক্ষ নীরব থাকলে আর এক পক্ষ থেকে আর কত ধৈর্য দেখান যায়।

—এ কথা তো আমি জানতাম না ?

কাজল গম্ভীর হয়ে যায়। ভাবনায় ভার হয়ে ওঠে মুখখানি।

—তুমি অনেক কথাই জান না। মেয়েদের যে কতদিক সামলাতে হয় তোমরা তা বুঝবে না।

—তা বটে। আমি তো এ সব ভাবতেই পারি নি।

—ভাবতে হবে না। বাড়ী যাও এবার। একটু পড়গে যাও। ছাতে দাঁড়িয়ে গল্প করলে আর পাশ করতে হবে না। আর পাশ না করলে—।

অজয় গলায় প্রত্যয় নিয়ে বলে, শুধু পাশ নয়। ভালভাবেই পাশ করব, বলে রাখলাম তোমায়। তারপর একটা ভাল চাকরি তো করতে হবে।

কাজল হাসে, যাও। এবার যাও। মা যদি ছাতে উঠে পড়েন।

অজয় কাজলের হাতের একটা ধাক্কা খেয়ে হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যায়। হঠাৎ ফিরে আসে ভয় পেয়ে।

—কী হল ?

অজয় ভীষণ ভয় পেয়ে বলে, দোতলায় মদনের গলা পেলুম।

কাজল এক মুহূর্ত ভেবে বলে, তাতে কী! বলবে, তোর সঙ্গে দেখা করতেই বসে ছিলুম। আমি বরং লুকিয়ে নীচে যাচ্ছি।

কাজল দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে চলে যায়।

অজয় একা একা দাঁড়িয়ে থাকে ছাতে। কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ওরও কি দোতলায় নামা উচিত, না ছাতেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা উচিত ? হঠাৎ কিছু ঠিক করতে পারে না।

তাকায় এধারে ওধারে। আকাশের দিকে তাকায়। সুনীল

আকাশের পশ্চিম দিকটা রক্তিম হয়ে এসেছে। বিকেলও গড়িয়ে এল। তাকাতে গিয়ে জ্বালা করছে চোখ দুটো। মাথাটা দিয়ে আগুন বেরচ্ছে যেন। কান দুটো গরম লাগছে ভীষণ। হাত-পায়ের তালু জ্বলে যাচ্ছে।

অজয় আলসেতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে সজাগ হয়ে তাকায়।

অবাক হয়ে দেখল, উঠে এল মদনলাল। মুখখানি গম্ভীর। ঠোঁটে তিক্ত হাসি।

—কতক্ষণ এলি ?

অজয় হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারে না।

মদনলাল এগিয়ে আসে। ওর কাছে এসে দাঁড়ায়।

অজয় কোনমতে বলে, এই তো, এই মাত্তর।

হাসে মদনলাল, হঠাৎ আবার চলে এলি ?

—তোর সঙ্গে দেখা করতে। তুই আমায় ক্ষমা কর ভাই। তোর মনে কষ্ট দিয়ে—।

—না, না, কষ্ট কিছু নয়। কষ্ট করা আমার অভ্যেস আছে। আর ক্ষমার কথা কেন মিছিমিছি বলছিস।

—মিছিমিছি নয়। তোর সঙ্গে দেখা করতেই এলুম।

মদনলাল হাসে।

অজয় বলে আবার, দুপুর থেকেই মনটা এমন খারাপ হয়ে গেল। ভাবলুম তোর কাছে না গেলে হয়ত রাত্তিরে ঘুমোতেই পারব না। বন্ধুত্বটা আমাদের অনেকদিনের। একটা মেয়ের জন্যে সেটা ভেঙ্গে যেতে পারে না।

—তুই তো ভাঙতে শুরু করেছিস।

—যাতে না ভাঙে সেই জন্যেই তো এসেছি।

—কেন এসব কথা বলছিস অজয়। তোর কাছে কাজল এখন আমার চেয়ে অনেক বড়।

—না। তোর এ ধারণা ভুল।

মদনলাল তিক্ত হাসি হেসে বলে, আমি লেখাপড়া শিখিনি বটে, কিন্তু ভুল বড় একটা করি না। যদি বলি তুই কাজলের কাছেই এসেছিলি।

—তবে বলব, মিথ্যে কথা বলেছিস।

—সত্যটা কী?

—সত্য তোকে আমি ভালবাসি। সেইটেই।

—তোর কথা শুনে এমন হাসি পায় অজয়। অন্য কেউ হলে—।

অজয় চুপ করে থাকে।

মদনলাল বলে, অন্য কেউ হলে আজই বাড়ি থেকে বার করে দিতুম।

—আমাকেও না হয় বার করেই দে।

—না। তোকে বার করতে পারি নে, সেইটেই তো আমার সব চেয়ে মুশকিল হয়েছে।

অজয় হাসে এতক্ষণে, কিন্তু তোর রাগ কেন?

—রাগ? রাগ নয়। তোর মত বোকার উপর রাগ করাও বোকামি।

—মানে?

—মানে। কাজল ছাদে ছিল। নেমে গেল নিজে চোখে দেখলুম। তুই কাজলের কাছেই এসেছিলি। অনেকক্ষণ আগে এসেছিস তাও জানি। তবু যে তুই মিথ্যে কথা বলে নিজের বোকামি জাহির করবার কেন চেষ্টা করছিস, বুঝতে পারি না।

অজয়ের পা দুটো কাঁপতে থাকে। সমস্ত শরীরের ভেতর ঝিম-ঝিম করতে থাকে। অন্য দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে। একটা কথাও আর মুখে যোগায় না।

মদনলাল হাসে। অজয় তাকায় ওর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে।

মদনলাল নীরবে হাসে।

তারপর অত্যন্ত তাচ্ছিল্য করে অজয়ের পিঠে দুটো চাপর মেরে বলে, যা বাড়ি যা। কাল আসিস।

অজয় যেন বেঁচে যায়। এমন একটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত যে জীবনে কখনও আসতে পারে ও ভাবতেও পারে নি। মদনলালের কাছে যে এমন চোরের মত ধরা পড়তে হবে কে জানত।

সব দোষ কাজলের। কাজলই তাকে শিখিয়ে দিয়ে গেল সে যেন বলে মদনদার সঙ্গে দেখা করতেই সে এসেছে আবার। বলতে গিয়ে কী ফ্যাসাদ!

জীবনে এমন ফ্যাসাদে কখনও পড়ে নি অজয়। কাজলের ওপর অদম্য রাগ হতে থাকে। কাছে পেলে হয়ত দুচার কথা শুনিয়ে দিত।

যাক। গুটি গুটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় অজয়।

মদনলাল ছাদে দাঁড়িয়ে আপনমনে নিশ্চয়ই খুব হাসছে।

কাজল দেখতে পায় অজয় চলে গেল। নিশ্চয়ই মদনলালকে ফাঁকি দিতে ও পেরেছে। কাজল মনে মনে যেন স্বস্তি অনুভব করে। মদনলালের সঙ্গে কথা বলবার একটু ফাঁক খুঁজে বেড়ায়।

সিঁড়ির নীচে সদরের গলিটা অন্ধকার থাকে। ওই খানেই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কাজল। মদনলাল এদিকে এলে ওর সঙ্গে ফালতু দু চারটে কথা বলে ওকে একটু সন্তুষ্ট করতে হবে। কিন্তু মদনলাল সেদিন সন্ধ্যায় দোতলা থেকে নামে না।

পরদিন সকালে স্কুলে যাবার মুখে রাস্তার মোড়ে হঠাৎ নজর পড়তেই থমকে দাঁড়ায় কাজল। অজয় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় ও অজয়ের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। ওর লজ্জা তো হয়ই, ভয়ও হয়।

অজয় কিন্তু ওকে দেখেই এগিয়ে আসছে। পাশ কাটাতে চায় কাজল।

বলা যায় না। রাস্তায় আত্মীয় বন্ধু কেউ দেখে ফেলতেও পারে। অজয়ের কি একটুও ভয় ডর নেই? এমন ডাকাতকে ভালবাসাও যে কী জ্বালা!

অজয় একেবারে কাছে এসে ফিসফিস করে বলে, মদন সব জানতে পেরেছে।

কাজল ভেবে রেখেছিল উত্তর দেবে না বরং রাস্তায় এই রকম ভাবে কথা বলতে আসার জন্য ধমকাবে। কিন্তু মদনলালের কথা শুনে ও নিজেও আতঙ্কিত হয়ে বলে, কী ?

—কাল তোমাকে ছাত থেকে নামতে দেখেছে। কথা বলতেও বোধ হয় দেখেছে। অথচ আমি মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে একেবারে বেকুব।

কাজল চিন্তান্বিত হলেও অজয়ের কথার ভাবে ওর হাসি পায়। নিশ্চয়ই কাল একেবারে বোকা বনেছে। মদনদার মুখ দেখে ধরতে পারল না সে সব দেখেছে কিনা ? এ কি রকম ছেলে রে বাবা ! গান গাইতে, গল্প লিখতেই জানে। আর কিছু জানে না !

—কি বললে ?

—বললে, তুই একটা বোকা।

আঁচলটা মুখে চাপা দিয়ে হেসে ওঠে কাজল।

—তুমি হাসছ ! তোমার জন্যেই তো—।

—আমার জন্যে। মুখ দেখে বুঝতে পারলে না মদনদা জানতে পেরেছে কিনা ?

—আমি তো জ্যোতিষ চর্চা করি নি।

—থাকগে, এখন যাও। বিকেলে এস।

—আমি আর আসব না আজ। দু চারটে দিন।

—কেন ?

—মদনকে মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে। দু' চারটে দিন যাক।

কাজলের মুখটা শুকিয়ে যায়।

আর কথা না বলে ও দ্রুত পায়ে স্কুলের রাস্তা ধরে। রাস্তায় এত মানুষ। কে জানে কেউ দেখে ফেলল কিনা ? আসবে না তো বয়ে গেল। নিজেই গোলমাল পাকাবে। আবার নিজেই সাত সকালে বলতে এসেছে আসব না। চারদিন !

চারদিন কী করে যে ওর কাটবে ভাবতেই কাজলের বুকের ভেতরটা মোচড় দেয়। চারদিন না দেখে থাকতে পারা যে কী সাংঘাতিক ভাবতে পারে না কাজল!

আজ হাসি পায় কাজল বসুমল্লিকের সে সব কথা ভেবে। কী মূর্খামি! আর কী পাগলামি! কী যে আনন্দ এই গোপন ভালবাসায়। সব সময় শঙ্কা। সর্বদা আতঙ্ক। ঠিক সময় আসতে একটু দেরি হলে কত বাজে ভাবনা আর কত অধৈর্য। চারদিন অজয়কে না দেখে থাকতে হবে ভাবতে কী যে আতঙ্ক হয়েছিল ওর, তা কাউকে বলে বোঝাবারও নয়। আঠারো বছুরে কাজলের কাছে সেইটেই ছিল সব চেয়ে বড় সত্য। আর আজ সে কথা ভেবে হাসিই পায়। মনে হয় এর চেয়ে বড় মিথ্যে বোধ হয় আর কিছুই নেই।

কী নেশায় যে পেয়েছিল তখন। লুকিয়ে চিঠি পড়া। অনেক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকা, ছুটো মিষ্টি কথা বলা, চিঠির পর চিঠি দেওয়া। তীব্র স্রোতের মত কেটে যেত দিনের পর দিন।

এ যে কি মারাত্মক নেশা। সুতীব্র সুমিষ্ট নেশা। তখন-তখন মনে হত এইটেই বুঝি জীবনের পূর্ণতা। এ ছাড়া যেটুকু কাজ, যেটুকু পড়া, সে সবই যেন বৃথা। সময়ের অপব্যয়।

মনে হত কাছে বসে কথা বলতে শুরু করলে বোধ হয় দিন রাতেও কথা শেষ হবে না। এত অফুরন্ত কথা। এত অকারণ কথা বলা।

কথা বলতে মুখ ব্যথা হয় না। চিঠি লিখতে হাত ব্যথা হয় না। মাথা টনটন করে না।

এই বয়েসের প্রেমের সুতীব্র মত্ততা, সেটা সত্যি না মিথ্যে এই বিচার করতে করতেই আরও বিশ বছর কেটে গেল। সঠিক উত্তর কি আজও পেয়েছেন কাজল বসুমল্লিক ?

নিজের কাছে নিজের এই প্রশ্নের জবাব সহসা মেলে না।

চুপ করে ভাবতে হয়। আরও ভাবতে হয় গভীর বোধ নিয়ে।

আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে মদনলালের কাছে বিকেলে গিয়েছিল কাজল। মদনলালকে একটু নাড়া-চাড়া দিতে হবে। কাজল তার মনোভাব জানে। একটু নাড়া দিতে পারলেই মদনলাল তার হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

ওপরে ছিল মদনলাল। ওপরের ঘরে বসে ফিল্ম ওয়াশ করছিল বোধ হয়। একটা ফটোর ছোট দোকান ছিল মদনলালের। ফটো তোলার ব্যবসাই ও করত পড়াশুনোয় ইস্তফা দেবার পর থেকে।

এর আগে কাজলকে ও অনেকদিন সেধেছিল, চল না দোকানে। তোমার একটা ফটো তুলে দিই।

কাজল রাজী হয় নি। একথায় সেকথায় এড়িয়ে গেছে।

আজ দোতলার ঘরে এসে মদনলালের কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিল্ম ওয়াশ দেখতে দেখতে প্রথমেই কাজল বলে, আমার একটা ফটো তুলে দিন না মদনদা ?

মদনলাল তাকায় ওর দিকে। হাসে।

হাসিটার ভেতরে যে জ্বালা আর ঈর্ষা দুটোই পাশাপাশি রয়েছে এটা কাজলের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় না। ও নিজেও একটু হাসে। যে হাসিটার একটা বিশেষ মানে খুঁজলে পাওয়া যায়।

মদনলাল তিক্ত স্বরেই বলে,—ফটো ? তোমার ? কেন অজয়ের কাছে তোমার ফটো নেই ?

কাজল ঘাবড়ায় না, না, নেই। ওকে ফটো দেবার প্রয়োজনও দেখি নে। কবে ফটো তুলবেন বলুন।

—চল। কাল চল।

— কখন ?

—এই সন্ধ্যায়। কিন্তু ফটো নিয়ে কি করবে বল তো ?

—হাতি করব। খিলখিল করে হেসে ওঠে কাজল।

মদন তাকায় ভাল করে ওর দিকে। অতি চতুর চোখ মেলেও মদন কাজলের কথার মানে আবিষ্কার করতে পারে না।

তবু মদন আর একবার বলে, অজয় আসে নি ?

—সেটা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন।

মদন একটু অবাক হয়, কেন ?

—আপনার তো বন্ধু।

মদনের ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস করে, আর তোমার ? কিন্তু বলে না।

একটু হেসে বলে, অজয় যে আমার শত্রু নয় কে বললে তোমায় ?

—আপনিই বলেন।

—না, আমি এখন আর তা বলি না।

—সে আপনার খুশী। কোনদিন আমাকেও বলতে পারেন তোমায় চিনি না।

আবার জোরে হাসে কাজল।

মদনলাল অনেকটা সহজ হয়ে আসছে।

একটু থেমে বলে,—তোমাকে ভাল করে চিনলামই বা কবে।

—চেনবার সুযোগ তো আপনার চেয়ে বেশী অন্য কেউ পায় নি ? দিনবাত তো দেখছেন।

অন্য কেউ যে কে সেটা মদনলালের বুঝতে বাকী থাকে না। আর বোঝা মাত্রই ওর মনের তলায় সুতীব্র ক্ষুধা তীব্রতর হয়ে ওঠে। ওর দুর্বল স্থানটাতেই ঘা দিয়েছে কাজল।

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে মদন।

বলে, তা হলে কাল সন্ধ্যেবেলা যাচ্ছ ?

—হ্যাঁ।

আর একটু আলাপ বাড়াবার জন্যেই যেন কাজল বলে, আচ্ছা আপনার দোকানে নতুন বর-বউ ফটো তুলতে আসে ?

—শুধু বর-বউ কেন, আরও অনেকে আসে।—মুচকে হাসে মদন।

—কারা ?

—যারা ভবিষ্যতে বর-বউ হবে।

অনেক কৌতূহল দেখিয়ে বলে কাজল, এমন ফটো আমায় দেখাতে পারেন ?

—অনেক।

—দেখাবেন কিন্তু।—বলতে বলতে ওঠে কাজল।

মদনলাল তাকায়, উঠলে ?

কাজল মিষ্টি করে একটু হাসে। কথা বলে না। উঠে বেরিয়ে যায়।

ভালই হয়েছে। মদনলালকে একটু খুশী করতে পেরেছে এই ভেবেই খুশী হয়ে ওঠে কাজল। ফালতু আলাপ করতে হবে মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে। চটলে হয়ত কোন ক্ষতি করে বসতে পারে। তার পক্ষে মদনলালের মত একটা ছেলেকে খুশী করে রাখা কিছুই নয়। যৌবনের অহঙ্কারটা তখন ওর এতই জোরালো ছিল যে এমন একটা ছেলেকে সে গ্রাহ্যের ভেতরেই আনত না।

আজ মনে হয় সবই যেন তামাশা। ওই বয়েসটা ভুল করবারই বয়েস। পর পর ভুল করেছিলেন তখন কাজল বসুমল্লিক। তখন বুদ্ধিটা ছিল রঙে ডুবে। রঙীন চোখে সংসারের কোন মানুষকেই তখন ঠিক-ঠিক দেখতে পান নি তিনি। মদনলালের কথা তিনি যেমন ভেবেছিলেন, যেমন করে ওকে হাতের মুঠোয় রেখে যৌবনকে উপভোগ করবার নেশায় মেতেছিলেন, তাও হল না। সবই গোলমাল হয়ে গেল।

কী নিদারুণ লজ্জা হয় আজ ভাবলে ওই ছেলেমানুষির দিনগুলো।

সবচেয়ে অবাক লাগে ভাবলে যে তারপরদিন বিকেলে যখন অজয় এল না। কাজলের কাছে সারা বিকেলটার আর কোন মানেই রইল না। বার বার ছাদে উঠতে হল, বার বার নীচে নামতে হল। কেবলই একটা কথা মনে হতে লাগল, আজ একবার কি অন্তত একটু সময়ের জন্যেও আসবে না?

ওর দাদা ওকেই জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁরে, অজয় কি এসে ফিরে গেছে?

দাদার ওপর হঠাৎ রাগ হল। বললে, তা আমি কি জানি?

বলে দ্রুত পায়ে চলে গেল রান্নাঘরে।

সন্ধ্যে যখন হয় হয় তখন মাকে বললে, মদনদার সঙ্গে একটু বেরোব মা? মদনদা বলছে আমার একটা ফটো তুলবে।

মায়ের অনুমতি নিয়ে মদনের সঙ্গে বেরোল।

বেরিয়ে রাস্তায় বার বার তাকাতে লাগল একজন মানুষকে দেখতে পায় কিনা? এত লোক যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, গিজগিজে ভিড়। কাউকেই তো কাজল চায় না। একটি মাত্র মুখ সে দেখতে চায়। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের ভেতর একটি মাত্র মুখ। সে মুখটি সে একান্ত নিজের বলে ভেবে নিয়েছে।

মদন কথা বলে যাচ্ছে। একটুখানি পথ যেতে একশ এক কথা।

কাজল কিছু শুনছে। কিছু বা শুনছে না। মাঝে মাঝে একটু একটু হাসছে। মানে সে যেন শুনছে।

—আচ্ছা, তোমরা তো বাড়ি করে চলে যাবে? তোমার বাবা জায়গা কিনবেন শুনলুম। তোমার বাবা আসবেন কবে? সত্যি বাইরের চাকরি যে কি কষ্টের তোমার বাবাকে দেখলে বোঝা যায়। কি হল শুনছ?

কাজল বলে একটু হেসে, শুনছি বই কি?

—আমার বাবা যখন মারা গেছেন, আমি তখন অনেক ছোট। তবু আমরা মানুষ হয়ে উঠছি তো? পড়াশুনা তো আমার সেই জন্যেই হল না। নইলে—

থেমে যায় মদনলাল। অন্যমনস্ক কাজলের দিকে তাকায়।

—তারপর বলুন। কাজল ওর কথায় তাল দিয়ে যাচ্ছে ঠিক।

—প্রথম যখন এখানে এলে, মনে আছে তোমার দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিলাম।

—হুঁ।

—তুমি চানাচুর খাচ্ছিলে। আমায় বললে খাবেন?

—হুঁ।

—আমি নিলুম না। তুমি নিশ্চয়ই একটু রাগ করেছিলে?

—হুঁ মানে, অ, না, মানে, এই আপনার দোকান এসে গেছে।

মদনলাল ওকে নিয়ে দোকানে গেল। দোকানে ওর কর্মচারী ছেলেটি চেয়ারে পা তুলে বসেছিল।

ওকে দেখে উঠে দাঁড়ায়।

মদনলাল ওকে ফটো তোলবার ব্যবস্থা করতে বলে কাজলকে বলে, বস চেয়ারে।

দোকানের পিছনে কাল কাপড়ে ঢাকা স্টুডিও। ভেতরে ঢুকে যায় মদনলাল।

কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে কাজলকে ডাকে, এস।

কাল কাপড়ের পর্দা দেয়া খুপরীর ভেতর নিয়ে যায়।

—দাঁড়াও এখানে।

কাজল দাঁড়ায়। মদনলাল বড় বড় কয়েকটা আলো জ্বালে।

ক্যামেরার কাছে গিয়ে মদনলাল বলে, নাও পোজ দাও।

কাজল হেসে ফেলে, পোজ দিতে পারব না।

হেসে ফেলতেই মদনলাল ছবি নিয়ে নিয়েছে।

এমনি করে পর পর তিনটে ছবি নিয়ে মদনলাল ছোকরাটার

সঙ্গে ফিস ফিস করে কি যেন কথা বলে। ছোকরাটা ঘাড় নাড়ে।

কাজল সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়।

মদনলাল এগিয়ে আসে। মুখে একটু সলজ্জ হাসি।

কাজল সরে দাঁড়ায়।

—কি হল? বলে মদনলাল, আমার পাশটাতে দাঁড়াও।

—কেন? ভয়ে ভয়ে বলে কাজল।

—এস না। ভয় পাচ্ছ নাকি?

—কেন বলুন না?

মদনলাল যেন একটু মুশকিলে পড়ে বলে, দুজনে একটা ফটো তুলতুম। আমার এই ছোকরাটা তুলতে পারবে।

কাজলের মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে। লজ্জায়, রাগেও।

স্পষ্ট গলায় বলে, না।

মদনলাল একটু অপ্রস্তুতে পড়ে যায়। মুহূর্তে সামলে নিয়ে বলে, থাক তবে। চল বাইরে বসবে চল।

কাজল বলে, আর বসব না মদনদা। বাড়ি যাব।

—একটু চা খাবে না?

—না।

—একটা লেমনেড খাও অন্তত?

—না।

—তবে চল।

ছেলেটাকে কি সব বলে বেরিয়ে আসে মদনলাল। কাজলকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

রাস্তায় কাজল আর কথা বলতে পারে না। মদনলালও কথা বলে না।

পরদিন ছুটির দিন। দুপুর থেকে কাজলের মন ভার। কিছুই ভাল লাগছে না। বসা নয়। শোয়া নয়। অথচ উঠতেও ভাল লাগছে না। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের ছবিটা অতি বিশ্রী মনে হচ্ছে।

তার চেয়েও বিশ্রী লাগছে ফুরফুরে বাতাস। বাতাসটা যেন থেকে থেকে তার মন উধাও করে দিচ্ছে। থেকে থেকেই মনে হচ্ছে কী যেন নেই, কী যেন চাই। ও জানে অজয় আজ আসবে না।

না আসুক। কে আর ওর জন্য পথ চেয়ে বসে আছে! অজয় তো ভারী একটা ছেলে! রাগে জ্বলে যাচ্ছে সর্ব শরীর।

এমন অকারণ রাগ যে কার ওপর তাও ও ভেবে পাচ্ছে না ছাই। শরীরটাই বোধ হয় খারাপ লাগছে। কই মাথা তো ধরে নি। এর চেয়ে মাথা ধরলেও ভাল হত। গায়ে হাতে পায়ে খুব ব্যথা হলে ভাল হত। শুয়ে থাকা যেত নিশ্চিন্ত হয়ে।

জানলার ধারে গিয়ে বসে। দাদা বাড়ি নেই। মদনদাও নেই। মা ওঘরে ঘুমোচ্ছে। একা একা কি যে অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে বলা যায় না।

বেরালটা পাশে এসে হাজির। একটা চড় বসিয়ে দিলে কাজল। হতচ্ছাড়ী মরবার আর জায়গা পেলে না। গায়ের ওপর মরতে এসেছে।

জানলা দিয়ে আবার বাইরে তাকায়। কী নির্জন রাস্তাটা। একটা ফেরিওয়ালাও কি যেতে নেই? ভাবতে ভাবতেই একটা বাসনওয়ালা যাচ্ছে একটা কাঁসি বাজাতে বাজাতে। অসহ্য! কী ঘ্যানঘেনে আওয়াজ কাঁসিটার!

টিকতে দিলে না! জানলা থেকে উঠে পড়ে কাজল। দরজার দিকে চোখ পড়তেই বোঁ করে ঘুরে আবার বসে পড়ে জানলায়। দরজা দিয়ে ঢুকছে অজয়।

জানলার গরাদ শক্ত করে দুহাতে ধরে বসে থাকে। চোখ বাইরের দিকে। বেশ বোঝে অজয় কাছে এসেছে।

—দাদা কই?

কাজলের বয়ে গেছে কথা বলতে।

—মদন নেই তো!

ওপরে গিয়ে দেখুন গে,—অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েই বলে কাজল।

অজয়ের গলাটা খুব নরম। অপরাধীর মত বলে, থাকতে পারলুম না। বাড়িতে কিছুতেই টিকতে পারলুম না। দুদিন আগে এসেছি বলে রাগ করলে ?

কাজল আর কথা বলবে কি ? আনন্দে বুকের ভেতরটা ওর কাঁপছে। তবু বাইরে কথা বলতে তার বয়ে গেছে। না এলেই পারত ! না আসাই তো উচিত ছিল। এল আবার জ্বালাতে !

—তবে না হয় চলি। অজয় ভয়ে ভয়ে বলে।

এই মরেচে ! আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগচ্ছে যে !

বাধ্য হয়ে একটু কেসে বলতে হয় কাজলকে, দাদার জন্যে একটু অপেক্ষা করলেই হয় !

অজয় দাঁড়ায়।

—তবে বসব একটু ?

—কে আর বারণ করছে।

অজয় কিন্তু বসে না। আবার কাছে আসে।

—তুমি এত বাগ করছ কেন ?

কাজলের ভেতর থেকে যেন একটা অভিমানের বাষ্প ঠেলে উঠছে গলা অব্দি। রাগ করবে না ? দুদিনের ভেতর একটু সময়ও বুঝি আর আসা যেত না ? ইচ্ছে থাকলে খুব আসা যেত। একটু না হয় দেখেও যাওয়া যেত।

- তবে কিন্তু আর কখনও আসব না।

—না এলে।

অজয় একটু থেমে বলে, না এসে যদি পারতুম তবে কি আর আজ লুকিয়ে লুকিয়ে আসতুম।

কাজল কথা বলে না।

অজয় বলে, মদন তো ধরে মার লাগাতেও পারে ? মারের ভয় থাকা সত্ত্বেও--।

এতক্ষণে হাসি পায় কাজলের : কী পুরুষ মানুষ ! মারের ভয়— !

অজয় আরও এগিয়ে আসে।

—যদি রাগ না কর, একটা কথা বলব ?

—বল না ?

—তোমাকে ছাড়া আর আমার বাঁচবার কোন উপায় নেই কাজল।

কাজল কথাটার মর্ম পুরো বুঝেও মুখ টিপে হেসে বলে, ওমা তাই নাকি !

—সত্যি। তুমি কথাটা অত হালকা ভেব না।

—তা আমি কী করব ?

—তোমাকে আমার বিয়ে করতেই হবে।

—তা করো।

—কিন্তু জাতে যে মেলে না। তোমার বাবা যদি রেগেমেগে—।

—তোমাকে মেরে বসতেও পারেন। আমার বাবা ভয়ানক রাগী।

অজয় বলে, তুমি কথাটার গুরুত্ব দিচ্ছ না।

কাজল এবার গম্ভীর হয়ে বলে, কি করে দেব। তোমার কথাগুলো যে খুবই কাঁচা। অমন কাঁচা কথার উত্তর দেওয়া যায় না। বিয়ের কথা এখন না ভাবলেও চলবে। আগে নিজে দাঁড়াবার চেষ্টা কর।

—তা বটে ! কিন্তু সে তো কতদিন কেটে যাবে।

—তোমার কি সবই তাড়াহুড়ো। একটু তর সয় না।

—আর তোমার সবই হচ্ছে হবে।

কাজল হেসে ফেলে, আচ্ছা, তুমি কি ভাব তোমাকে ছেড়ে থাকাটাই আমার খুব ইচ্ছে ? তা যদি ভাব তবে তাই। কিন্তু আমার ভয় হয় কি জান। তুমি এত সোজা মানুষ আর এত তড়বড়ে যে শেষকালে একটা গোলমাল বাধিয়ে না দাও।

অজয় আরও কাছে আসে। কাজলের কাঁধে হাত রাখে। আরও কাছে টানতে চায়।

কাজল হাসে ঃ অই দেখ। কোন কাজে সবুর নেই, ভয় ভাবনা নেই। এখনই যদি দাদা এসে পড়ে ?

—জুতোর শব্দ পাব।

—তুমি যা ঝোঁকে আছ, কানে শুনতে পাবে, আমার বিশ্বাস হয় না। পেলে আমিই শুনতে পাব।

—তা হলেই আমার শোনার কাজ হবে।

—সর। কী হচ্ছে !

কাজল জানলার তাক থেকে উঠে পড়ে।

অজয় আর এগোয় না। জিজ্ঞেস করে, মদন কি বললে ?

—ওর কথা ছাড়। তোমার কি কথা আছে তাই বল।

—কিন্তু ওর কথা তো ছাড়া যায় না।

—সে ভার তো আমি নিয়েছি। তোমার দ্বারা তা হবে না।—সগর্বে বলে কাজল।

অজয় হাসে, বেশ, তবে তো আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু—।

—আবার কিন্তু কী ?

—সেদিন ওর একটা কথায় আমার বড় খটকা লেগেছিল।

—কী কথা ?

—ও বলেছিল, আমার হাতে তৈরী জিনিস তোর হাতে তুলে দিয়েছি।

কাজল খিলখিল করে হাসতে থাকে।

হাসতে হাসতে বলে, আমি ওর হাতে তৈরী জিনিস ? বেশ বলেছে কিন্তু !

অজয় বলে, এটা কী হাসির কথা ?

—না, হাসির হবে কেন, কান্নার কথা।

—কথাটা কিন্তু তুমি যত সহজে গ্রহণ করছ। তত সহজ নয়।

কাজল বলে, দেখ, সব ব্যাপারে তুমি বেশী বুদ্ধি খাটিও না। এখন যাও।

অজয় আর কথা না বলে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগোয়।

অনেক সময় কেটে গেছে। এর পর হয়ত সত্যিই কাজলের দাদা এসে পড়বে। এসে পড়লে বড় বিশ্রী দেখাবে। তা ছাড়া মদনলালও এসে পড়তে পারে। অজয় চলে যায়।

দিন কয়েক কেটে গেছে এর পর। কাজল মদনলালের কাছে আবার গেছে। ফটো দেখেছে। হেসেছে। কথা বলেছে। মদন-লাল কিন্তু কিছুতেই আর বেশী কথা বলে নি। কেমন যেন মন মরা হয়ে গেছে ও দিন কয়েক ধরে।

মাঝে মাঝেই দেখে মদনলাল দোতলার বারান্দা থেকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। অনেক ভাবনা ভরা চোখে। কাজলের চোখে চোখ পড়তেই অন্য দিকে তাকায়।

কাজল ভেবে পায় না কী হল মদনলালের।

সেদিন কাজলের দাদা ওর মাকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিল। কাজলেরও যাবার কথা ছিল। কিন্তু ওর ভাল লাগল না যেতে। মাথাটা একটু ধরেছে। শরীরটাও ভাল নেই।

কাজল রয়ে গেল ঘরে। কাজলের মা মদনের মাকে বলে গেল মেয়েকে একটু দেখে রাখতে। দেখে রাখবার অবশ্য কিছু নেই। তবু বয়সের মেয়ে!

কাজল দোরটা ভেজিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে রইল একা একা। অন্ধকারে শুয়ে যথারীতি অজয়ের কথাই ভাবতে লাগল। অজয়ের সান্নিধ্য চিন্তা করতে কেন যে এত ভাল লাগে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে পারে এই এক চিন্তায়। এ বয়েসের এ ধ্যান যে কত গভীর! আশে পাশের তুনিয়াটা ভুল হয়ে যায় এ ধ্যানে। প্রেমে ধ্যানমগ্না হয়ে ওঠে কাজল।

কখন যে দরজাটা খানিকটে খুলে গেছে ও টের পায় নি।

ও একেবারেই টের পায় নি যে একজন অন্ধকার ঘরে ঢুকে ওর পিঠের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত তপ্ত নিশ্বাস যখন ওর গালের ওপর লাগে তখনও বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করে নি।

মুখের ওপর একটা তপ্ত নরম স্পর্শে ও চমকে উঠে বসে পড়ে।

—কে?

—আমি, চুপ!

মদনলালের কণ্ঠ। ভয়ে কাজলের গলাটা শুকিয়ে যায় মুহূর্তে। ও উঠে আলো জ্বালতে যায়।

ওর একখানা হাত চেপে ধরে মদনলাল।

—কী চাই আপনার? আপ্রাণ চেষ্টায় বলতে পারে কাজল।

—কয়েকটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে। ভয় নেই। বস।

—আলোটা জ্বালতে দিন।

—থাক না। মদন ওর হাত ছাড়ে নি তখনও।

কাজল রাগে লজ্জায় অপমানে বলে, আমি কিন্তু চেঁচাব।

মদনলাল হাসে, তোমাকে বলা হয় নি। মাস কয়েক আগে অজয়ের লেখা গোটা কতক চিঠি আমার কাছে আছে। সেগুলো তোমাকে আর দিয়ে উঠতে পারি নি। আমার কাছেই রয়ে গেছে।

কাজল হতাশ হয়ে বসে থাকে। আর একটা কথা বলবার শক্তিও পায় না। অজয়ের লেখা চিঠিগুলো বাড়ির সবাই জেনে ফেলার পরিণামটা যে কী হবে, সেটা তাকে আর বলে বোঝাতে হয় না মদনলালের। কাজল বসে বসে ঘামতে থাকে।

মদনলাল মিষ্টি গলায় বলে, ও কথা থাক কাজল। একটা কথা তোমাকে না বললে আমি যে আর বাঁচতে পারছি না। আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি জান না দিন রাত আমি জ্বলে যাচ্ছি।

কাজল আরও ভয় পায়। ভীষণ ভয় পায়।

মদন বলতে থাকে, আমি নিজেই নিজের পা কেটে ফেলেছি কাজল। অজয়কে একদিন আমিই তোমার কাছে এনেছিলাম। —তোমাদের ভালবাসার সুযোগ করে দিয়েছিলাম। দিনের পর দিন তোমাদের কথায় হাসিতে আনন্দ পাব ভেবেছিলাম। কিন্তু আর সহ্য করতে পারছি না। কেন যে পারছি না, জানি না।

কাজল নীরবে বসে থাকে। ওর মাথার ভেতরটা যন্ত্রণায় টনটন করে। হাত পাগুলো কাঁপতে থাকে।

—আমিও তো কিছু চাই। কেন আমি তোমার জন্যে এতখানি করেছিলাম। জান তুমি? কিছু পাবার আশায়। তবু যদি কিছু পাই।

কাজল কিছুতেই আর একটা কথাও বলতে পারে না।

—বল কাজল। কিছু একটা বল।

অনেক পরে ধরা গলায় কাজল বলে, কি বলব ?

—তুমি আমাকে কিছুই দেবে না ?

—কি চান আপনি ?

—তুমি তো জান। বহুদিন থেকে জান। অজয়ও পুরুষ, আমিও পুরুষ। আমাকে তুমি এমন করে অপমান করবে কেন ?

—অপমান ?

—হ্যাঁ। অপমান। দিনের পর দিন আমায় অপমান করছ। মদনলালের গলা ভিজে ওঠে।

কাজল চুপ করে বসে থাকে। মদনলালের জন্যে ওর এই প্রথম আজ একটু কষ্ট হয়। কথাটা হয়ত মদনলাল সত্যিই বলেছে। ও কিছু তো পায় নি। পেয়েছে কাজলের বিদ্রূপ। কাজল ওকে একটা নেশার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই ভাবে নি। ওর প্রাণের দিকে এক মুহূর্তের জন্যেও তাকায় নি। ভুলেও চোখ ফেরায় নি। বেচারী মদনলাল !

—অপমান করে থাকলে ক্ষমা করুন।

মদনলাল চুপ করে বসে থাকে। কথাটার জবাব দিতে পারে না। গলাটা বোধ হয় ওরও ধরে এসেছে।

কিছুক্ষণ পর একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে মদনলাল। বলে, আমি জানি আমি মুখ্‌খু। আমি ভাল ভাল কথা বলতে জানি না। একটা ফটোর দোকানের দোকানদার। কিন্তু আমারও তো কষ্ট হয়। আমারও দুঃখ ভাবনা আছে।

কাজল নড়ে চড়ে বসে। মদনলালের কথাগুলো ওর প্রাণ স্পর্শ করছে। এখন আর মদনলালের ওপর রাগ করতে পারছে না। ওকে বদমাইশ বলে ভাবতে পারছে না। খেলার জিনিস বলে মনে করতে পারছে না। মদনলালের ভেতরের মানুষটাকে অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কাজল।

—মদনদা!

মদন তাকায়।

—আপনার কথা আমার মনে থাকবে।

মদনলাল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। বেরিয়ে যেতে গিয়ে আবার ফিরে আসে।

—আর একটা কথা ছিল।

—কী?

—তোমাকে ছুঁয়ে যদি অন্যায় কিছু করে থাকি, কিছু মনে করো না।

কাজল চুপ করে বসে থাকে। একথার উত্তর দেয়া প্রয়োজন বোধ করে না। ও দেখতে পায় অন্ধকারের ভেতর মদনলাল দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। চলে যাবার আগে দোরটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে যায়।

চুপ করে বসে থাকে ও বিছানার ওপর। অনেকক্ষণ। মননলালকে ও যা ভেবেছিল, সবই ভুল।

একটা মানুষকে এতকাল ধরে কতখানি ভুল করে এসেছিল কাজল ভেবে অবাক হয়।

মদনলাল যা কিছু বলেছে, যা কিছু করেছে, সব কিছুরই একটা খারাপ মানে করে নিতে অভ্যস্ত হয়েছিল ও।

কিন্তু আজ সে সব কথা কত ভুয়ো বলে মনে হচ্ছে।

মদনলাল কিছু চায়। কি চায় তাও কাজল জানে।

কাজল যে কোনদিন তা দিতে পারবে না তাও জানে।

কারণটা আর কিছুই না। তার নিজের দেবার মত আর তো

কিছুই সে রাখে নি। সবই অজয় গ্রাস করে নিয়েছে। তার চিন্তা, তার ভাবনা, তার যৌবন, তার মন, সব এই মুহূর্তে একমাত্র অজয়ের।

দিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে কাজল। আজ নিঃস্বের কাছে ভিক্ষে করতে এসে মদনলাল কী পাবে ?

মদনলাল চাইতে পারে। চেয়েছে।

কাজল কিছুই দিতে পারে নি। দেয় নি।

কারও দোষ নেই। অথচ একটু টেরিয়ে দেখলে দুজনেরই দোষ দেখা যায়।

বার বার কাজলের কষ্ট হয় আজ মদনলালের কথা ভেবে। কিন্তু কী যে করবে এখনও ঠিক ভেবে উঠতে পারে না। চুপ করে শুয়ে পড়ে আবার।

কয়েকদিন কেটে গেছে এর পরে। অজয় এসেছে। কথা বলেছে। মাঝে একখানা চিঠিও দিয়েছিল। তাতে লেখা বিশেষ কিছুই ছিল না। কাজল এত গম্ভীর কেন জানতে চেয়েছে। কাজল কয়েকদিন ধরেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকছে।

ঠিক যে কিছু ভাবছে তা নয়।

মদনলাল এসেছে ঘরে। কথা বলেছে হেসে। মদনলালই বরং একটু বেশী কথা বলছে কয়েকদিন। বড্ড খুশি খুশি যেন।

কাজল সেটা লক্ষ্য করেছে। কিছু বলে নি। চুপ করেই থেকেছে বেশী সময়।

সেদিন অজয় কাজলকে হঠাৎ ধরল বাইরের ঘরে। মদন বাড়ি ছিল না। দাদাও ছিল না। অজয় যেন এই সুযোগই খুঁজছিল।

কাজলের হাতটা চেপে ধরল অজয়। খুব জোরে।

—আঃ লাগে।—বলতে গিয়ে অজয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে অজয়ের চোখদুটো টকটকে লাল।

—একি ! কি হল !—কাজল অবাক হয়ে যায়। ভয় পেয়ে যায়।

অজয়ের গলা যে এত কঠিন হতে পারে কে জানত। কঠোর স্বরে অজয় বলে, খেলাটা এবার শেষ করে যেতে চাই।

—কিসের খেলা ?

—আর বোকা সাজবার প্রয়োজন নেই। অভিনয়ে যে তুমি পাকা তার প্রমাণ পেয়েছি। কিন্তু কেন আমাকে নষ্ট করলে অমন করে ? জবাব চাই।

—কিসের নষ্ট! কী হয়েছে বল ?

—যা হয়েছে সবই তো তুমি জান। আমার মুখ থেকে আবার সেটা শুনলে কি ভাল লাগবে তোমার ?

—আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

অজয় রক্তবর্ণ চোখ নিয়ে হাসে। কী কদর্য দেখায় অজয়কে। কাজল বড্ড ভয় পায়।

—ভেবেছিলে বুঝি এমনি করেই চালিয়ে যাবে আরও অনেক দিন।

কাজল কী বলবে বোঝে না।

অজয় আবার বলে, কিন্তু সব ফাঁক হয়ে গেছে। আমি আজ তোমার কাছ থেকে একটা মাত্র কথার জবাব নিয়ে চলে যাব। আর কখনও আসব না।

কাজলের কান্না পায় অজয়ের ভাব-সাব দেখে।

মুখটা নীচু করে বলে, বল, কিসের জবাব চাও ?

—তুমি মদনলালকে ভালবাস ?

—তুমি কি বিশ্বাস কর ?

অজয় একটু থমকে যায়। একটু ইতস্তত করে বলে, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আসে যায় না। আমি এর প্রমাণ পেয়েছি।

কাজলের মুখটা কঠিন হয়ে আসে, তোমার বিশ্বাসেই তো সত্যি আসে যায়। যাক প্রমাণ কী পেয়েছ শুনি ?

—প্রমাণ, মদন আমায় বলেছে, কয়েকদিন আগে রাত্রে তার কাছে—

কাজল জ্বলে ওঠে। তবু নিজেকে সংযত করে বলে, মদনদার কথা বিশ্বাস কর ?

—করি। তার কারণ ও এমন একটা কথা বানিয়ে বলতে পারে বলে মনে হয় না।

—তবে তাই সত্যি।

—কী সত্যি ?

—মদনদাকে আমি ভালবাসি।

অজয় কথা বলে না। ওর চোখ দুটো চিকচিক করে ওঠে।

কাজল অজয়ের আরও কাছে সরে আসে।

—বিশ্বাস হল ?

অজয় নীরব। অজয় যা আশা করেছিল তা পায় নি। হতাশার বেগে স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

কাজল ম্লান মুখে একটুখানি হাসে : দেখ। তুমি যা পেয়েছ আর কেউ আমার কাছ থেকে তা পায় নি। পাবেও না।

অজয় তাকায়। সত্যি সত্যি ওর চোখ দুটো জলে ভরে এসেছে।

—মদনদার কথা বিশ্বাস করে এমন ভুল আর কখনও করো না। তাতে তুমি যতখানি কষ্ট পাও, তার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট পাই আমি।

অজয় মাথাটা নীচু করে বলে, আমার অন্যায় হয়েছে কাজল।

কাজলের গলাটাও এবার ধরে আসে, তোমাকে নিয়ে হয়েছে আমার জ্বালা।

অজয় ম্লান মুখে হাসে।

—এবার বাড়ি যাও।

অজয় ওর খুব কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে।

কাজল একটু কঠিন স্বরে বলে, যাও, এবার বাড়ি যাও।

অজয় হাসতে গিয়েও কাজলের গম্ভীর মুখ দেখে হাসতে পারে না। আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে যায়।

কাজল ভেবেছিল, ব্যাপারটা এখানেই মিটে যাবে। কিন্তু মিটল না। কয়েকদিন কাটল চুপচাপ। কাজল মদনের সঙ্গে কথা বলা কমিয়ে দিল। তাতে কিন্তু মদনলালের উৎসাহের অভাব নেই। সময় পেলেই আসে কাজলের কাছে। কথা বলতে চায়। উত্তর পায়। কথা বাড়াতে গেলে বেশী উত্তর পায় না।

সেদিন তুপুরে বৃষ্টি পড়ছিল জোরে। দাদা বাড়ি ছিল না। মা গিয়েছিলেন আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে। সেখানে গিয়ে হয় তো আটকে পড়েছিলেন।

কাজল ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। বই সামনে খুলে রেখে বসেছিল।

জানলা দিয়ে দেখছিল অজস্র ধারায় জল ঝরছে। বাতাস বইছে। বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে চোখে মুখে। কপালের ওপর খুচরো চুলে। তবু জানলা বন্ধ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

সামনের বাড়ির নির্জন বারান্দার দেয়ালের উঁচু সীমানায় কয়েকটা পায়রা বসে বৃষ্টি থেকে বাঁচাচ্ছে নিজেদের। কিন্তু বাতাসের বেগে বৃষ্টি থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

নিরুপায় হয়ে ভিজছে ওরা। কত নিরুপায় ওরা।

কাজলের মনটা খারাপ লাগে।

ঘোলাটে আকাশটার ঠিক রঙ বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে পরিষ্কার হয়ে নীল হবার আগেই রাশি রাশি মেঘ এসে ঘোলাটে করে তুলছে আকাশকে।

ভাল লাগে না কাজলের। আকাশের দিকে তাকিয়ে ও নিজের ভেতরে কোথায় একটা মিল পায়। উঠে পড়ে। বাইরে বেরিয়ে আসে।

ঘেরা বারান্দায় এসে হঠাৎ অজয়ের গলা কানে আসে। কখন এল অজয়? তার কাছেই বা এলনা কেন? বাইরের ঘরে কথা বলছে কার সঙ্গে?

ও ধীরে ধীরে বাইরের ঘরের ভেজান দরজার কাছে যায়।

শোনে অজয় বলছে, তোরই ভুল মদন। এ হতে পারে না।

মদনের গলা শোনা যায়, ভুল আমি করি নি।

—করতেও তো পারিস কোন কোন ব্যাপারে।

— না। আমি যা বলছি ঠিক।

—কাজল তো আমায় তেমন কিছু বলল না।

--তোর কাছে মিথ্যে বলছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে চমকে ওঠে কাজল।

—কিন্তু তোর কথা বিশ্বাস করবার মত কোন যুক্তিই যে খুঁজে পাচ্ছি নে।

—সত্যি কথা। অত যুক্তির ধার ধারব কেন। সেদিন রাত্রে আমাকে যা ও বলেছে, তা মিথ্যে হতে পারে না। তাছাড়া অন্ধকারে পাশাপাশি বসে হাতে হাত রেখে অত কথা—।

—কিন্তু এটা একটা খেলাও তো হতে পারে ?

—না। খেলা অত গভীর হয় না। কিন্তু আমি যদি উলটো বলি।

—কী ?

—তোকে নিয়ে খেলা করছে।

—না। আমায় সে কথা খুলেই বলেছে।

— দেখ্, ওকে আমার চেয়ে তুই বেশী চিনিস না।

— কেন ?

—আমি ওকে বহুদিন ধরে দেখছি।

—বহুদিন ধরে দেখলেই যে কাউকে চেনা যায় একথা ঠিক নয়।

— তবে কিসে চেনা যায় ?

—ভালবাসলে।

—কাজল তো আমায় ভালওবাসে।

—ওইটে আমি স্বীকার করতে পারছি নে।

—তোর যুক্তি কী ?

—আমার কথাও আমি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারব না। তবে

এটা নিশ্চয় যে কাজল আমাকে যা দিয়েছে, তার চেয়ে বেশী আর কাউকে কিছু দিতে পারে না।

—তবে তুই কী বলতে চাস?

—আমি বলি, তোর ভুলটা তুই বুঝতে পারলে সবদিক থেকে ভাল হয়।

—কি রকম?

—আমাদের বন্ধুত্বও থাকবে। কাজলও থাকবে। আমিও থাকব। তুইও থাকবি।

—নইলে কী হবে বলছিস?

—নইলে কী যে হবে, সেটা একটু ভাবলে তুইও বুঝতে পারবি।

– বেশ তুই আমার ভুল ভেঙ্গে দে।

– আমি?

অজয়ের গলা আর শোনা যায় না।

কাজল বাইরে থেকে দৌড়ে ঘরে চলে আসে। ছি, ছি, মদনদা কি বলছে! তার শ্রদ্ধাকে ভালবাসা বলে ভুল করে বসল? মদনদাকে তার খারাপ লাগে এমন কথা সে বলে নি ঠিকই। কিন্তু ভাল লাগলেই কি ভালবাসতে হবে?

মদনদার এ ভুল তাকেই ভাঙতে হবে। নইলে এর পরিণাম কখনই ভাল হবে না। মদনদাকে যা সত্যি সেটা কাজলকেই জানাতে হবে। অজয় সে কথা জানবে কোত্থেকে?

অসহ্য লাগছে মদনদার কথাগুলো। সেদিন রাত্রে সে মদনদাকে মানুষ বলে ভাবতে পেরেছিল। তাকে সমবেদনা জানিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে মদনদা এমন ভুল করে বসবে?

কাজল কাগজ পেন্সিল নিয়ে তখুনি লিখতে বসে।

একবার লেখে। আবার ছিঁড়ে ফেলে। আবার লেখে।

তারপর সেই টুকরো কাগজটা হাতে নিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ে।

অজয় আর মদনলাল দুজনেই চমকে ওঠে।

কাজল নীরবে অজয়ের হাতে কাগজের টুকরোটা দিয়ে চলে আসে।

দোরটা ভেজিয়ে ফাঁক দিয়ে ওরা কি করে দেখবার লোভ সামলাতে পারে না।

অজয় কাগজের টুকরোটা খোলে।

জোরে পড়তে থাকে—'আপনাদের কথা হঠাৎই কানে গেল। মদনদার ভুলটা তাঁর বোঝা উচিত। তাঁকে আমি বড় ভাইয়ের মতই ভালবাসি। সেদিন রাত্রে এই কথাই তাকে বোঝাতে চেয়ে ছিলাম।

মদনদাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। আর একটু স্থির হতে বলবেন। কাজল।'

অজয় কাগজের টুকরোটা পড়তে পড়তে হাসে। পড়া শেষ হয়ে গেলে কিন্তু গম্ভীর হয়ে কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে চুপ করেই বসে থাকে।

মদনলালের মুখখানা আকাশের মেঘের মত থমথমে।

বাইরে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির ঝিরঝির শব্দ মনের ওপর সুর তোলে। সুরটা বড়ই করুণ।

মদনলাল একটা নিশ্বাস ফেলে, দেখি চিঠিটা।

অজয় নীরবে চিঠিটা ওর হাতে দেয়।

মদনলাল চিঠিখানা পড়তে থাকে। চার লাইনের চিঠিটা পড়তে কুড়ি মিনিট কেটে যায়। পঁচিশ মিনিট। তিরিশ মিনিট।

অজয়ের চোখেও বেদনার আভাস।

বেচারী মদনলাল!

কাজলের মনটা আবার মদনলালের জন্যে সমবেদনায় ভরে ওঠে। কিন্তু এবার তাকে আবার সাবধান হতেই হবে।

ধীরে ধীরে কাজল নিজের ঘরে চলে আসে। এসে চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়। বড় শ্রান্ত লাগছে।

একজনকে দুরন্ত রাগে সব শক্তি দিয়ে কয়েক ঘা চাবুক মারবার পর যে রকম শ্রান্তি আসে, তেমনি শ্রান্তি, ক্লান্তি।

এর পর থেকে মদনলাল আর একটাও কথা বলত না ওদের কারও সঙ্গে। নেহাত প্রয়োজনে যখন দু-একটা বলতে এসেছে কাজল লক্ষ্য করেছে, গলা কেঁপেছে মদনলালের। মুখখানা ম্লান হয়ে গেছে। দিনের পর দিন চোখের সামনে শুকিয়ে যাচ্ছে মদনলাল।

কাজলের বড় কষ্ট হয়। তবু অজয়ের কাছে ওর কথা কখনও বলে না।

মদনলালকে ও আর একটুও প্রশ্রয় দেয় না।

ওর ভয় হয়ে গেছে বিগত কয়েকটি ঘটনায়। কি করতে কী হয়ে যাবে, কে জানে!

কথা আর ব্যবহার ও সংযত করে ফেলেছে। বিশেষ করে মদন লালের সঙ্গে।

অজয় আসত রোজই। কথা হতো। হাসি হতো। সব কিছুর ভেতরেও মদনলালের ম্লান মুখখানা কাজলকে বড় বেদনা দিত। অজয়কে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিত না সে কথা। অজয় নিজে থেকেই সেদিন বললে, মদন কিন্তু সত্যিই তোমায় ভালবাসে।

কাজল হাসল। কথা বলল না।

—ওকে দেখলে আজকাল কষ্ট হয়।

এর উত্তরে কাজল আবার একটু হাসে মাত্র। কোন কথা বলে না। বলতে চায় না। ইচ্ছে করেই এ ধরনের আলোচনা এড়াতে চায়।

কাজল অন্য কথা পাড়ে, অনেকদিন কিন্তু তোমার গান শুনি নি।

—গান আজকাল আর বেশী গাই না। ছবি আঁকি বেশী।

—আমাকে আঁকতে পার।

—খু-উ-ব। আঁকব একদিন। ভাল করে সামনে বসতে হবে।

—কি রকম ?

—মানে মডেল হতে হবে। মডেল জান তো ?

—কি রকম ?

—মডেল মানে গায়ে কোন কাপড়চোপড় থাকবে না।

—ধেৎ। অসভ্য !—কাজলের মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে।

অজয় বলে, তবে ছবি আর হল না। গানই শুনো।

—কবে শোনাবে ?

—যেদিন বলবে। হারমোনিয়াম বার করে দিও একদিন। তোমার মাকেও ডেকে দিও। এমন কালী-কীর্তন শিখেছি কয়েক-খানা, তোমার মাকে জল করে দেব।

—থাক। খুব হয়েছে। মাকে আর জল করতে হবে না।

—তাতে সুবিধে হবে।

কাজল হাসে, আর সুবিধে হলে রক্ষে নেই। যাও এবার বাড়ি যাও। রাত হয়েছে।

—যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তোমাকে ছেড়ে রাত আর সকাল দুপুর কি করে যে কাটে!

—তবে কি আমায় নিয়ে যাবে ?

—সত্যি যাবে ? চল না। কোথাও চলে যাই।

কাজল গম্ভীর হয়ে ওঠে, সে সব পরে ভাবব। এবার বাড়ি যাও। ঠাণ্ডা পড়ছে।

অজয় চলে যায় তাড়া খেয়ে।

পরমুহূর্তে কাজলের কষ্ট হয়, এমন তাড়া করে না তাড়ালেও হতো। মেয়েমানুষ হওয়া যে কী জ্বালা! না বললেও জ্বালা। বললেও জ্বালা। ভাবলেও জ্বালা। না ভাবলেও জ্বালা। ভালবাসলেও জ্বালা। ভাল না বাসতে পারলেও জ্বালা।

আজও তো এ জ্বালা মুছে যায় নি কাজল বসুমল্লিকের মন থেকে। সব চেয়ে রাগ হয় তার ওপর, এ মনটাকে যে গড়েছিল। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, আরও কি একটু কঠিন করা যেত না মেয়েদের মন। করা কি যেত না আরও একটু শুকনো ?

তা যদি নাও করা যায়, সংসারটাকে কি একটু কম নিষ্ঠুর করা যেত না।

মেয়ে হয়ে জন্মালেই কি এ জ্বালায় জ্বলতেই হবে ?

এ প্রশ্নের জবাব কাজল বসুমল্লিক পান নি, তাই তো আজ পর্যন্ত নিজেকে কঠোর করে তোলবার সাধনাই করে এসেছেন। সবগুলো সুকুমার বৃত্তিকে নিষ্পেষণ করেছেন, সমূলে নষ্ট করে ফেলতে চেয়েছেন, মেয়ে হওয়ার অপরাধকে। তাই তো আজও মাঝে মাঝে ওঁর মনেই হয় না যে উনি মেয়ে মানুষ।

এক বিরাট পার্টির নেত্রীস্থানীয় তিনি আজও। পুরুষরা তাঁকে মেয়ে ভাবে না। তিনি ভাববার মত কোন সুযোগই দেন না। তাঁরা ভাবে তাদের মতবাদের ধারক, তাঁদের উপদেষ্টা। সেখানে মেয়ে-পুরুষের ভেদজ্ঞান বড় একটা থাকে না।

তবু কী যে হয় মাঝে মাঝে রাত্রে। ঘুমোতে পারেন না কাজল বসুমল্লিক।

না ঘুমলেও নিজেকে আলগা করেন না কখনও। কিন্তু আজ যে কী হলো? অজয়কে দেখবার পর থেকেই কাজলের পুরনো সবগুলো বৃত্তিই আবার যেন ভেসে উঠেছে মনের আকাশে।

ভাবতে ভাবতে বিহ্বল হয়ে পড়ছেন। নিজের ভাবনার ওপর সংযম থাকছে না।

তখন দিনগুলো যেন পাখা-মেলা পাখির মত উড়ে যাচ্ছিল একে একে। এক যৌবন-প্রমত্ত মন নিয়ে দিনরাত কাব্য রচনা

করেই চলছিলেন। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে পর্যন্ত মন চাইত না।

ভেবেছিলেন এমনি করেই বুঝি কেটে যাবে জীবনের আরও অনেক দিন। কিন্তু তখন কি জানতেন যে জীবনের দিনগুলো যত ছোট ভাবা যায় তত ছোট নয়।

কোন কোন দিন যে গ্রীষ্মের গুমট রাত্রির মত কিছুতেই কাটতে চায় না কে জানত। কে জানত যে মাত্র কয়েকটা দিন কয়েক বছরের মত মনে হয়। প্রতিটি মুহূর্ত কাটানো অসহ্য হয়ে ওঠে।

এই রকম কয়েকটা দিন কাজলের জীবনে অবশেষে এল।

সেই একদিন, প্রথম দিনটা যেদিন অজয় এল না, সেদিনটা কিছুতেই আর কাটতে চাইল না কাজলের।

আগের দিনও অজয় বলে গিয়েছিল আসবে, এসে একখানা ভাল বই দিয়ে যাবে পড়তে। একটু সকাল সকালই আসবে। সে যেন গলিতে অজয়ের জন্যে অপেক্ষা করে।

বেলা তিনটে থেকে দোরের কাছে বারকয়েক আনাগোনা করল কাজল। বার বার তাকাল রাস্তার দিকে। কিন্তু এল না অজয়।

ছাতে গেল। ছাতে গিয়ে রাস্তার মোড়ের দিকে তাকিয়ে রইল। ওই রকম নীল জামা গায়ে কোন মানুষ দেখা যায় কি না। দেখা গেল না।

আবার নীচে এল। আবার ওপরে গেল।

বিকেল গেল। সন্ধ্যে হয়ে এল। অজয় এল না।

সন্ধ্যেবেলা আনমনা হয়ে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল কাজল। দোরটা আগলে যে কাজল দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা ওর খেয়ালই ছিল না।

মদনলালকে বাধ্য হয়ে বলতে হল, সরো একটু।

শুনতে পেল না কাজল।

—কই যেতে দাও।

এবারে শুনতে পেয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল কাজল। লজ্জায়

কথা বলতে পারল না। মদনলাল একবার তাকাল ওর দিকে। কি একটা কথা বলতে চাইল। কিন্তু বলল না।

তখুনি বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

নীরবে নিজের ঘরে চলে এল কাজল।

পরদিনও অজয় এল না। দুপুরে নয়। বিকেলে নয়। রাত্রেও নয়।

তারপর দিন ?

না। অজয় এল না।

চুপ করে শুধু ঘোরাঘুরি করা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে ও ? বার বার দোরের কাছে গেল। ছাতে গেল। পরীক্ষার পড়া রেখে চটিটা পায়ে দিয়ে দু চারবার রাস্তায় গেল গোপনে। মাকে না বলে। তাকাল এদিক ওদিক। না। মানুষটার কোন চিহ্নই নেই।

রাগে দুঃখে বিবর্ণ হয়ে গেল কাজল।

সে কি জানে না যে একজন তার জন্যে ভাবতে পারে ? ভেবে ভেবে এক অসহনীয় অবস্থায় পড়ে ছটফট করতে পারে ? একবার কি কাউকে দিয়ে একটা খবরও দিতে পারত না ?

মদনদাকেও বলতে পারত। তাকে খবর দিতে।

এবার একবার আসুক। দেখাবে কাজল মেয়েমানুষের রাগ কাকে বলে।

দোরে একটু বাতাসের শব্দ হলে ছুটে যাওয়া আর হতাশ হয়ে ফিরে আসা। এর ভেতর যে কতখানি বেদনা অজয় কি বুঝবে ? বুঝত, মেয়ে হলে বুঝত।

লজ্জায় কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারছে না কাজল। কে কি মনে করবে ? হয়ত ভাববে তার এত মাথা ব্যথা কেন ? কিন্তু মদনলাল তো তাদের কথা সব জানে। ওকে জিজ্ঞেস করলে হয়।

না। কিছুতেই পারবে না কাজল।

মদনলাল হয় তো মুচকে হাসবে, হয় তো ইচ্ছে করেই কোন খবর দেবে না। তখন অপমান রাখবার জায়গা পাবে না ও।

রাত্রে ঘুম হল না। কেবলই মনে হতে লাগল অজয় বোধ হয় অসুখে পড়েছে। যত রাত বাড়তে লাগল, ততই মনে হতে লাগল, নিশ্চয় কোন বেশী অসুখে পড়েছে অজয়।

অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজেও আতঙ্কে কেঁপে উঠতে লাগল কাজল। অজয় মরে যায় নি তো?

যদি মরে গিয়ে থাকে?

ভাবতে ভাবতে বালিশ ভিজে গেল চোখের জলে। কেঁদে ফেলল কাজল।

না। মরে গেলে নিশ্চয় মদনলাল তাকে বলত, তবে হয় তো কোথাও চলে গেছে কাউকে না বলে। এমনও তো হতে পারে, সে হয় তো অজান্তে ওকে কোন আঘাত করেছিল সইতে না পেরে চলে গেছে অজয়।

কত আবোল তাবোল চিন্তাই যে মাথায় আসে!

ধীরে ধীরে ছটা সুদীর্ঘ দিনরাত কেটে গেল।

সাতদিনের দিন কাজল আর সহ্য করতে পারল না।

দাদা পড়ছিল ঘরে। ও বসে পড়ছিল।

লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করল দাদাকে, আচ্ছা দাদা, অজয়দা আর পড়তে আসেন না?

—না। মাথাটা নীচু করেই ওর দাদা উত্তর দেয়।

—কেন? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে কাজল।

ওর দাদা তাকায়। মুখটা গম্ভীর। বলে, জানি না।

দাদার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখে কাজলের মনটা আরও অধৈর্য হয়ে পড়ল। কী ব্যাপার? নিশ্চয়ই তবে অজয়ের কিছু হয়েছে। কিন্তু দাদাকে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। চুপ করেই থাকতে হল।

আরও দুদিন কাটল। দীর্ঘ আরও অসহ্য দুটো দিন।

ভয়ে আর চিন্তায় চেহারা ওর এই কদিনেই অনেক কাহিল হয়ে পড়ল। আশ্চর্য ভাবে রোগা হয়ে যেতে লাগল কাজল।

সেদিন দুপুরে ও ধীরে ধীরে দোতলায় গেল। মদনলাল এই সময়টায় দোকান থেকে ভাত খেতে আসে। তারপর নিজের ঘরে বিশ্রাম করে বিকেলে বেরোয়।

কাজল মদনলালের ঘরে ঢুকল।

মদনলাল কাত হয়ে শুয়েছিল, ও ঘরে ঢুকতে যেন অবাক হয়ে উঠে বসল।

—কী খবর ?

—না, কিছু নয়। চোখদুটো নীচু করে ফেলল কাজল। পাছে চোখে চোখ পড়লে মদনলাল ওর মনের কথা টের পায়। ওর বেদনার আভাস পায়।

—বস।

কাজল বসল। একটু সময় চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করবে কিনা ভাবল।

তারপর বলে ফেলল, অজয়দার কী অসুখ করেছে ?

এমন ভাবে কথাটা জিজ্ঞেস করল যেন ও জানে অজয়ের অসুখ করেছে।

মদন হেসে ফেলল। মিষ্টি করে বলল, কে বললে অসুখ করেছে ?

—তাই ত শুনেছি।

—ভুল শুনেছ। অসুখ তার করে নি।

কাজলের বুকটা কাঁপতে থাকে। চোখ দুটো নীচু করে মনের ভাব লুকোয়। তারপর খুব সহজ স্বরে বলবার চেষ্টা করে,—আর আসে না কেন ?

—কে জানে ? মদনলাল একটা হাই তোলে।

এরপর কাজলের উঠে যাবার কথা। কিন্তু তবু কাজল বসে থাকে।

মদনলাল হাই তুলে একটু তুড়ি দেয়, এ তো জানা কথা।

কাজল ভয়ে ভয়ে তাকায় ওর দিকে। অর্থাৎ কী ?

মদনলাল আবার কাত হয়।

অন্য কথা পাড়ে, তোমার পরীক্ষা তো সামনে। কেমন পড়া হল?

কাজল বলে, কই, তেমন আর হচ্ছে কই ?

মদনলাল সহজস্বরে বলে, ওর জন্যে ভেবে পড়া নষ্ট করো না। ও ভালই আছে।

—ভালই আছে!—বলতে বলতে গলাটা কাঁপে কাজলের।

—তা নয়ত কী ? রোজই কেলাবে দেখা হচ্ছে ওর সঙ্গে। তাস হচ্ছে। আড্ডা হচ্ছে। তক্ক হচ্ছে। কি না হচ্ছে ?

—তাই নাকি ? তাসও খেলে বুঝি ?

—তা আর খেলে না ? ওকে চিনতে তোমার আরও দুবার জন্মাতে হবে। যাক গে আমার ও সব কথায় কী দরকার।

কাজল চুপ করে বসে থাকে। এক বড় নিশ্বাস ফেলে তাকায় আবার মদনলালের দিকে।

মদন আবার একটা হাই তোলে।

—ওর কথা আর ভেব না। যা বলি শোন।

কাজল তবু বসে থাকে ও সব কথা জানতে চায়। সব শুনতে চায়।

মদনলাল বলে, কিছু মনে যদি না কর, সব কথা বলতে পারি। এতদিন বলি নি। তার মানে বললে হয়ত মনে করতে হিংসেতে বলছি। তা নয়। বহুদিন থেকেই তো ওকে জানি। এক মেয়ে ধরে, তাকে ছাড়ে, আবার আর এক মেয়ে ধরে। এখন কাকে ধরেছে জান ?

কাজল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

—রমলাকে। আমাদের বন্ধু দেবুর মামাতো বোন। দিনরাত্তির কেলাবে রমলার গল্পই করে। তোমার নেশা বোধ হয় কেটে গেছে। তবে যদি বল—

কাজল তাকায়।

—মানে কি জান? ওই যে অত ভাল গান গায়। ছবি আঁকে। ওইতেই তো গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে ওর কাছে এসে ধন্না দেয়। তোমাকে আগে বললে তো আর বিশ্বাস করতে না? যাক। রমলার সঙ্গে এখন জমেছে খুব।

কাজল একটা কথাও বলতে পারে না আর। আস্তে আস্তে উঠে পড়ে। নীচে নেমে আসে।

পড়বার ঘরে চেয়ারের ওপর এলিয়ে পড়ে। গায়ে যেন আর একটুও জোর নেই। মাথায় যেন আর একটুও ভাববার ক্ষমতা নেই। জড় পদার্থের যত নিশ্চেতন হয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। এই দেয়াল, এই ঘর, ওই গলি, ওই দূরের গাছটা, কিছুরই যেন আর মানে নেই। সব অর্থহীন পাষাণের মত স্থির। অর্থহীন।

অনেক সময় কাটে। বিকেলের দিকে ওঠে কাজল। উঠতেই মাথাটা ঝিমঝিম করে। আবার বসে পড়ে। একটু একটু করে ভাবনা ঢুকছে ওর মাথায়।

কি করে ও ভুলবে?—এই প্রশ্নই আজ সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই চেয়ারে বসেই অজয় প্রথম লিখেছিল তার প্রথম কথা এক টুকরো কাগজে। সেদিনটা ও কী করে ভুলে যাবে? দরজার গলিটায় কত সন্ধ্যায় কত কথা বলেছিল অজয়। ওই গলিতে কি আর কখনও যেতে পারবে কাজল? দাঁড়াতে পারবে কিছুক্ষণ। সন্ধ্যায় গলির নির্জন অন্ধকারটা তার মনকে কি কালো করে দেবে না? এত বড় একটা শূন্য গহ্বরে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল অজয়?

চুপ করে বসে বসে ভাবে কাজল।

ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা উতরে যায়। অন্ধকার ঘরে চুপ করে বসে থাকে ও।

মা আলো জ্বালাতে ঘরে ঢুকল, কি লো, আজু আলোটাও জ্বালাতে পারিস নি? কি পড়াই না পড়ছিস?

কাজল বলে,—পড়তে পড়তে মাথাটা ঘুরছিল মা।

—তবে থাক। শুয়ে পড় গে যা।

মা বেরিয়ে যান।

কাজল তেমনি চুপ করেই বসে থাকে। দোতলায় রেডিওতে কি একটা গান হচ্ছে। গানটা মোটেই ভাল লাগে না কানে। দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে আবার এসে বসে ও।

এই কথাটাই ও কিছুতে বিশ্বাস করতে পারছে না যে অজয় ওর সঙ্গে খেলা করতে এসেছিল। তাই যদি না এসে থাকবে, তবে এমন করে ছেড়ে যেতে পারল কি করে?

এত কথা! এত ভালবাসা! এত বড় মিথ্যে, বিশ্বাস হতে চায় না তবু।

মদনলালও তো মিথ্যে বলতে পারে?

মিথ্যে বলে মদনলালের লাভ কী? মদনলাল এ কথা নিশ্চয়ই জানে যে সে কাজলের ভালবাসা কোনদিনই পাবে না। তবুও যদি মিথ্যেই বলে থাকে, তবে অজয় কি কোনরকমে একবারও তার সঙ্গে দেখা করতে পারত না? রাস্তায় তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারত না? কাউকে দিয়ে একটা চিঠি পাঠাতে পারত না? না। মিথ্যে হতে পারে না।

নিশ্চয়ই অজয় এমনি খেলা করে মেয়েদের সঙ্গে। তাদের সর্বস্ব হরণ করে নিদারুণ হতাশা আর জ্বালার গহ্বরে ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে পালায়।

এ অপরাধের ক্ষমা নেই। কোনদিনই বোধহয় অজয়কে ক্ষমা করতে পারবে না। কোনদিন না।

নতুন একটি মেয়ের সঙ্গে সে খেলায় মেতেছে। রমলা তার নাম। রমলাকে যদি ও চিনত তবে তাকে গিয়ে বলে দিয়ে আসত অজয়ের সব কথা। এখুনি গিয়ে বারণ করে আসত অজয়কে প্রশ্রয়

না দিতে। অথবা অজয়কে নিয়ে একটু খেলা করতে শিখিয়ে দিয়ে আসত।

যৌবনের ব্যর্থ জ্বালায় চোখদুটো জ্বলতে থাকে কাজলের।

দুচোখ বেয়ে অনর্গল জল পড়ে। আঁচলে মোছে, তবু আবার চোখে জল আসে।

চোখের জল শুকল। সূর্য উঠল পরদিন ভোরে, আবার ডুবল। আবার উঠল, আবার ডুবল। দিনগুলো বসে রইল না। রাতগুলো কাটল ঘুম ছাড়াই। ক্রমে চোখের জলের বদলে শূন্যতাই ওকে পেয়ে বসল ধীরে ধীরে। এ দিনরাতের বিরাট সময়ের ফাঁক ভরাবার চিন্তায় অধীর হয়ে উঠল কাজল।

পরীক্ষার পড়াতে সময় কাটে না। সঙ্গিনীদেব আলাপে সময় কাটে না। এ যেন এক বিরাট ফাঁক। যৌবনের এ শূন্যতাকে আবিষ্কার করল ও অজয়কে হারিয়ে।

আর কিছু দিয়ে, আর কাউকে দিয়ে, এ ফাঁক তাকে ভরে তুলতেই হবে।

এ ছাড়া বাঁচবার আর কোন পথ নেই। দিনরাত আবার এক নতুন নেশায় মাততে হবে। আশ্রয় করতে হবে আর একজনকে। এ ছাড়া বাঁচবার কোন উপায় নেই।

অজয়কে ভুলতেই হবে। আর কাউকে না পেলে অজয়কে. ভোলা যাবে না।

ভাবতে ভাবতে চোখের ওপর ভেসে উঠল এক পুরুষের চেহারা। সে মদনলাল। মদনলালকেই তার পেতে হবে। মদনলালকে দিয়ে অজয়কে সে জানাবে যে তার মত পাগলের সঙ্গে সে প্রেম করে

নি, খেলাই করেছিল। অজয়কে জানাবে সে মদনলালকেই ভালবাসত। অজয়ের সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করত।

মদনলাল অজয়ের সঙ্গে রোজই আড্ডা দেয় ওদের ক্লাবে। সেখানে রোজই ওদের দেখা হয়। সেখানেই মদনলালকে দিয়ে অজয়কে দিনের পর দিন জ্বালাতে হবে। তবে যদি তার জ্বালা কিছুটা মেটে।

সেদিন দুপুরেই গেল ও মদনলালের ঘরে।

মদনলাল খেয়ে উঠে বিশ্রাম করছিল। চোখ দুটো বুজে একটু শুয়েছিল।

কাজল দোর খুলে ঘরে ঢুকলো।

পা টিপে টিপে তন্দ্রাচ্ছন্ন মদনলালের কাছে গেল। ওর হাত দুটো ধরল।

মদনলাল চমকে তাকালঃ কে? কাজল?

মদনলালের বুকে তখন হাতুড়ি পড়ছে। ও কি স্বপ্ন দেখছে। কাজল তার হাত ধরেছে!

ও কী বলবে কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। আতঙ্কে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল। কাজলকে সরাতে গেল। কাজল সরল না।

মদনলাল কিছুক্ষণ পরে প্রথম কথা বলল, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

—না। এইটেই সত্যি। আগে যা হয়েছে সেটা স্বপ্ন।

বলতে বলতে আরও কাছ ঘেঁষে বসে কাজল।

মদনলালের ওঠবার ক্ষমতা নেই। শরীর অবশ।

—কিন্তু—।

কাজল যা বলতে এসেছে, তাই বলে, কিন্তু না মদনদা, বরাবরই আপনাকেই ভালবাসতুম। অজয়ের পাগলামির ভয়ে এতদিন বলতে পারি নি। বললে বিশ্বাস করবেন না, ও আমায় যাদু করেছিল, আচ্ছন্ন হয়ে ছিলুম এতদিন। বুঝতে পারি নি যে আপনি ছাড়া আমার উপায় নেই।

মদনলাল ধীরে ধীরে ওঠে।

একটু গম্ভীর হয়ে বলে, কথাটা কিন্তু বিশ্বাস করতেও ভয় হচ্ছে আমার।

—ভয় নেই। আমাকে নির্ভয়ে বিশ্বাস করুন।

—আগে তবে—।

—আগে যা করেছি তার জন্য ক্ষমা চাইছি। ক্ষমা করুন আমায়।

বলে একটু হেসে আবার বলে কাজল, দোষ কিন্তু আপনার কম নয়।

—আমার?

—আপনার নয়তো কার? কেন ওই পাগল ছেলেটাকে এনে জোটালেন?

—ও তো নিজেই এল।

—আপনিই তো সুযোগ করে দিয়েছিলেন?

—তা বটে। আমার অন্যায় হয়েছে কাজল।

মদনলাল এবার সাহস করে কাজলের হাতদুটো ধরেঃ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে তুমি আমার জন্য এতটা ভাব। এ নিয়ে অবশ্যি অজয়ের সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে ছাড়ি নি।

—বেশ করেছেন। ঠিকই করেছেন।

মদনলাল এবার জুত করে বসে। কাজল হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, অজয়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়?

—হুঁ। রোজই ত খেলতে আসে।

—একটা অতি বাজে ছেলে। ওকে শুনিয়ে দেবেন যে ওর মত পাগলকে নিয়ে আমিও খেলা করেছি। আমার ভালবাসা অত সস্তা নয় যত সস্তা সে ভেবেছিল।

—বলব। তবে ওর সঙ্গে আর এ সব কথা বিশেষ হয় না। ও এখন রমলাকে নিয়ে ব্যস্ত।

—তবু শুনিয়ে দেবেন। ও সব বাঁদরদের একটু শোনানো দরকার।

মদনলাল হাসে ঃ শুনিয়ে দিতে পারব।

কাজলের চোখে মুখে অসহ্য জ্বালা প্রকাশ পায়। কাছে পেলে বুঝি অজয়কে নখ দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। আঁদিম ভাবাবেগে অস্থির হয়ে ওঠে কাজল। অজয়কে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ও মদনলালকে বলে, একদিন ধরে ওকে মারতে পারেন না?

হাসতে হাসতে বলে মদনলাল, কী হবে ওকে মেরে? যেতে দাও। চল আজ সিনেমায় যাই।

কাজল গুম হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

—চল না। মাসিমাকে বলে রাজী করিয়ে নেব আমি।

—আজ নয়। কাল যাব।

—বেশ কালই হবে। তারপর একটু বেড়িয়েও আসা যাবে, গাড়ি করে।

—কোথায়?

—এই ট্যাক্সি নিয়ে এখানে ওখানে। যাবে তোমাব যেখানে খুশি। হেসে ওঠে মদনলাল।

কাজলও হেসে ওঠে খিল খিল করে। অনেকদিন পরে আজ ও প্রথম হাসতে পারল।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বলল, কাল দুপুরে আসব।

মদন ঘাড় নাড়ে।

পরদিন দুপুরে ঠিক এল কাজল। মদনলাল যেন ওরই অপেক্ষা করছিল। ঘরটায় দুটো জানলা। কাল বন্ধ ছিল। আজ জানলা দুটোয় সবুজ পর্দা দেখে কাজল একটু হাসে। মদনলাল কালই কিনে এনেছে বোধহয়।

কাজল ঘরে ঢুকে বলে, পর্দা কিনলেন কবে?

—কাল। মানে, জানলা নইলে খোলা যায় না। বড় মুশকিল, মানে ইয়ে—

কাজল হেসে ফেলেঃ মানে আর বলতে হবে না।

—আজ সিনেমায় যাবে না?

—যাব। মা কি রাজী হবেন? সামনে পরীক্ষা।

—সে সব আমার ওপর ছেড়ে দাও।

—আর দাদা যদি কিছু বলে?

—তোমার দাদা আমার হাতের মুঠোয়।

—মানে?

—বলবে না কাউকে?

—না। বলব না।

—গেল মাসে পনের টাকা ধার নিয়েছে আমার কাছ থেকে।

কাজল অবাক হয়ঃ কেন?

মদন হাসেঃ বোধহয় থিয়েটার বায়স্কোপ যাবার জন্যই। তাছাড়া একটা শাড়িও কিনেছে।

—কেন?

মদন হাসেঃ সব কথা তোমাকে বলব—? আচ্ছা বলেই ফেলি, মানে, কোন একটি মেয়ের জন্মদিনে তাকে উপহার দিতে হয়েছে।

—দাদার সঙ্গে আবার কোন মেয়ের আলাপ?

—সে আছে। তুমি চিনবে না। আমি চিনি। মেয়েটি দেখতে খুবই ভাল।

কাজল মনে মনে খুব হাসে। দাদাও তাহলে—। তাই বল, এই জন্যই দাদার বাড়ি ফিরতে মাঝে মাঝে রাত হয়।

অজয়ের কথা মনে পড়তেই কাজল বলে, কাল ক্লাবে গিয়েছিলেন?

—হুঁ।

—অজয়কে যা বলতে বলেছিলাম বলেছিলেন?

—বলেছিলাম।

—শুনে কী বললে?

মদন প্রশ্নটায় একটু থমকে গেল। বললে, কী আর বলবে। মুখটা শুকিয়ে গেল। একটা কথাও বলতে পারলে না আর। বলবার কি আর মুখ রেখেছে।

কাজল মনে মনে খুব খানিকটা হাসল। ঠিক হয়েছে। এই ভাবেই ও দিনের পর দিন জ্বালাবে ওকে।

অজয়কে জ্বালাতেই হবে, নইলে ও বাঁচতে পারবে না। মেয়েদের এতবড় অপমান মাথায় করে নিয়ে বইতে পারবে না। অতি কঠিন কঠিন ঘা দেবে ও অজয়কে। অজয়ের বিরুদ্ধে মদনলালকে যন্ত্রের মত চালাবে। উপযুক্ত শিক্ষা দেবে ওকে। ও বুঝুক যে কাজল ক্ষেপে গেলে বিষাক্ত সাপের চেয়েও বেশী বিষ ছড়াতে পারে। বিষে বিষে নীল করে দেবে অজয়কে।

ফুঁসিয়ে ওঠে কাজল। ঠিক হয়েছে।

মদনলালের দিকে তাকিয়ে খিল খিল করে হেসে বলে ওঠে: ভারী আনন্দ লাগছে আজ।

মদন অবাক: কেন?

—কেন কী জানি। বোধহয় আপনাকে এত কাছে পেয়ে।

মদন বলে, এখনও আপনি?

—আপনিই ভাল। বেশ আপন আপন শোনায়।

অজয়কে ছাড়া আর কাউকে ও তুমি বলতে পারবে না। না পারলে আর কী করা যাবে?

কাজল ওর নিজের হাতের আংটিটা খুলে মদনলালকে পরিয়ে দেয়।

—এ কী!

—আনন্দ লাগছে তাই পরিয়ে দিলাম।

—তোমার দাদা মা যদি আংটিটা দেখে ফেলে?

—লুকিয়ে রাখবেন। আমি বলব হারিয়ে গেছে। শুধু বাইরে বেরুবার সময় পরে বেরুবেন।

—কেন?

—দেখাবেন। অজয়কে দেখাবেন। বলবেন যে আপনাকে ভালবাসতাম সেইটেই সত্যি।

মদনলাল আংটি পরে খুশি হয় খুবই। বলে, দেখাব। সব বন্ধুকেই দেখাব।

—তাই দেখাবেন। সবাইকে দেখাবেন।

মদনলাল কথা পালটায়ঃ তা হলে সন্ধ্যাবেলা আজ যাচ্ছ ?

—হ্যাঁ। মাকে বলে রাখবেন। আমি তৈরি হয়ে থাকব।

বলে চলে যায় কাজল।

এরপর থেকে দিনের পর দিন মদনলালের সঙ্গে ব্যবহারে কথায় দৃষ্টিতে বানানো প্রেমের বন্যা বইয়ে দেয় কাজল। মদনলালের মনকে একেবারে হাতের মুঠোয় করে ফেলে। মদনলালকে যা বলে তা মদনলালকে শুনতেই হয়। না শুনে ওর উপায় নেই। এমনি করে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ওকে কাজল।

মদনলালকে ও পুরোপুরি অজয়ের বিরুদ্ধে কাজে লাগায়। প্রতি দিনই আঘাত করবার কিছু না কিছু সুযোগ বা ফন্দি খুঁজে বার করে।

একদিন বলে ফেলে মদনলালকে, ওকে আজ ভুলিয়ে ভালিয়ে আনতে পারেন মদনদা ?

মদন চমকে ওঠে, কেন ?

—ওকে মনের সুখে একটা চড় মারতুম। বলতে বলতে হেসে ওঠে ও।

মদনলালের মুখটা শুকিয়ে যায়ঃ মানে, এনে কী দরকার ? আর মারামারি করে শেষকালে যদি থানা পুলিস, মানে—থাক না—।

কাজল হাসতে হাসতেই বলে, তবে এই চিঠিটা ওকে দেখাবেন।

—কিসের চিঠি ?

—এই দেখুন না ?

ব্লাউজের ভেতর থেকে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ বার করে

মদনের হাতে দেয়। মদন চিঠিটা পড়ে। অতি কঠোর অতি নিষ্ঠুর একখানি চিঠি।

'মদনদা, কাল বিকেলে কিন্তু পরীক্ষা আমার শেষ হচ্ছে। পরশু নিশ্চয়ই আমায় বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে একটি কুকুর থাকলে অবিশ্যি দুজনে ভারী মজা করতে পারতুম, হাসতে পারতুম। আমি তো কিছুদিন আগে একটি কুকুর পুষেছিলুম। কুকুরটার নাম অজয়। একেবারে নেড়ি জাতের। তাই কঁ্যাও কঁ্যাও করতে করতে চলে গেল। নইলে মন্দ ছিল না জানোয়ারটা, ওটাকে খেলাতে বেশ আরাম লাগত। আবার যদি একটা কুকুরের খোঁজ পান জানাবেন। কাল সন্ধ্যেবেলা যা দিয়েছিলুম। তাই আর একবার নিন। ইতি কাজল।'

মদনলালের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায় পড়তে পড়তে।

বলে, এ চিঠিটা দেখাতে হবে?

খিল খিল করে হেসে ওঠে কাজল ঃ হ্যাঁ, দেখাতে হবে?

মদনলাল একটু ইতস্তত করে তবু।

কাজল কঠিন স্বরে বলে, ওরকম জাতের ছেলেকে এই রকম চিঠিই দেখাতে হয়। এ চিঠি দেখাতেই হবে।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে মদনলাল বলে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—করুন।

—যা চুকে গেছে, তা নিয়ে আর কেন ঘাঁটতে যাওয়া।

—না। চুকে যায় নি মদনদা। যে অপমান ও আমাকে করেছে, সেটা পুরোপুরি ওকে ফিরিয়ে দিতে না পারলে আমার শান্তি নেই।

মদন হাসে একবার ঃ তুমি রাগলে কিন্তু ভীষণ!

—সব মেয়েই তাই। মেয়েদের আপনি চেনেন না মদনদা।

—কিন্তু আমাকেও তো ও অপমান করেছিল, আমি তো—।

—আপনার কথা আপনি জানেন। আমার কথা তো আপনি জানেন না?

—তা বোধহয় জানি নে।

কাজল মদনের হাতদুটো চেপে ধরেঃ এ চিঠি আপনাকে দেখাতেই হবে মদনদা।

মদন ম্লানমুখে বলে, বেশ। দেখাব।

কাজল চুপ করে বসে থাকে। মদনও।

এমনি করেই দিনের পর দিন কাটছিল। কিন্তু বহুদিন একভাবে কাটে না। সংসারের অব্যর্থ নিয়মে মদনলাল আর কাজলের ভেতর প্রথম ছাড়াছাড়ি হয় ওরা এ বাড়ি থেকে উঠে যাবার পর।

ততদিন অজয়ের ওপর প্রচুর বিষ ছড়িয়েছিল কাজল।

বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর কতকটা যেন শান্ত হল। মদন ওদের বাড়ি তখনও যেত কিন্তু আগের মত ঘনিষ্ঠ ভাবটা আর রইল না।

কলেজে ভর্তি হয়ে কাজল পড়া আর বান্ধবী নিয়ে বেশী-সময় ব্যস্ত রইল।

মদনলাল বলতে ছাড়ে নিঃ কলেজে পড়ে তোমার অহঙ্কার বেড়েছে কাজল।

কাজল গম্ভীর হয়েই বলত, ঠিক তা নয়। কী জানি কেন, আর ভাল লাগে না।

—কী ভাল লাগে না, আমাকে ?

কাজল গম্ভীর হয়েই বলে, হয়তো তাই।

কারণটা বুঝতে মদনলালের একটু সময় নেয়।

অজয়ের ওপর নিদারুণ নিষ্ঠুর প্রতিশোধের পালা তখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। বছর তিনেক কেটে গেছে। মদনলালকে আর কাজলের তেমন প্রয়োজন নেই।

—প্রয়োজন মিটে গেছে বোধহয় ?—বাঁকা হেসে বলে মদনলাল।

কাজল চুপ করে বইয়ের পাতা ওলটায়।

—চল না আজ সিনেমায় যাই।

—ভাল লাগছে না।

—জান অজয় এম-এ তে ফার্ষ্ট হয়েছে।

—অ! বেশ ত।

মদনলাল ওকে আর কোনদিক থেকেই সুবিধে করতে পারে না। অগত্যা যাতায়াত কমিয়ে দেয় ধীরে ধীরে। কাজলও আসতে বলে না। এলেও তাড়ায় না। কাজল শান্তি পেয়েছে। অজয়ের অপমানের শোধটা সে পুরোমাত্রায় নিতে পেরেছে এইটেই ওর শান্তি।

কিন্তু ভুল করেছিল কাজল। সংসারে শান্তি মোটেই সুলভ নয়। একদিন যখন ভাবল, এতদিন যা করেছিল ও, সবই এক মস্ত ভুলের ওপর বিশ্বাস করে; সেদিন আক্ষেপের আর অন্ত রইল না। সে আক্ষেপকে মুছে ফেলবার সময়ও তখন ছিল না আর। অনেক দেরী হয়ে গেছে। ভুলের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে চলে গেছে।

যে বিষ সেদিন অজয়ের ওপর ছড়িয়েছিলেন কাজল বসুমল্লিক, সে বিষ আজও নিঃশব্দে হজম করে চলেছেন তিনি। নিজে আজীবন বোধকরি সেই বিষের জ্বালা মোছবার চেষ্টাই করে চলেছেন। কিন্তু আজও মুছল না।

কাজল বসুমল্লিক হেরে গেলেন। জীবনের প্রথম পর্যায়ে পুরোপুরি হেরে গেলেন। নীরবে যে রইল সেই জিতে গেল। কালের কি অপরূপ বিচার!

দিনরাত জ্বলে যায় ভেতরটা। তবু কিছু বলবার উপায় নেই। মুখ খোলবার উপায় নেই।

ঘটনাটি ঘটল ওর বিয়ের দিন দুপুরে। আর একবার সব ওলট পালট হয়ে গেল। সব ভুল বলে মনে হল আরও একবার।

আঘাত করে করে ক্লান্ত হয়েই পড়েছিল তখন কাজল। অজয়ের সম্বন্ধে আর চিন্তা করতেও ভাল লাগত না। সবচেয়ে খারাপ লাগত তখন মদনলালকে। তাই বাবা মা যখন বিয়ের কথা তুললেন,

বিয়ে স্থির করলেন তাকে না জানিয়েই, আপত্তি করে নি কাজল। খুব একটা খারাপ যে লাগল ওর তাও নয়। নতুন করে জীবনের স্বাদ পেলে হয়ত আবার ভাল লাগবে দিনগুলো এই আশায়।

কিন্তু আশা আশাই থেকে গেল।

বিয়ের দিন দুপুরেই এল মদনলাল। আর একবার এবং শেষবার।

বিয়ে বাড়ির যে ঘরটায় ও বসেছিল, সে ঘরটায় অনেকগুলো মেয়ে ছিল। কাজলকে ঘিরে বসেছিল ওরা। মদনলাল দোরের একপাশে দাঁড়াল। ওর চেহারা দেখে চমকে উঠল কাজল। চুল রুক্ষ। চোখের তলায় স্পষ্ট গাঢ় কালিমা।

কাজল ভাবল, তবে কি তার বিয়ে হচ্ছে বলে মদনলাল তার মনের কষ্ট প্রকাশ করতে এসেছে?

ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল ওর।

মদন একসময় ইশারায় ডাকল ওকে।

অত্যন্ত বিরক্ত হল কাজল। সাহস তো কম নয় মদনের? ওকে আজ একটু শিক্ষা দিতে হবে। ঘর থেকে বেরিয়ে এল ও। মেয়েগুলোকে বলে এল, আসছি কলঘর থেকে।

বেরিয়ে এসে কাজল ভ্রূদুটো কুঁচকে বলে, কিছু বলবেন?

মদনলাল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়, বলে, একটু আড়ালে—।

কাজল কোন কথা না বলে ছাদে উঠে যায়। মদনও পিছন পিছন ওঠে। দারুণ রোদে এককোণে চলে এল ওরা।

মদনলাল কোন ভণিতা না করেই বললে, জানি না, ক্ষমা করতে পারবে কিনা, কিন্তু কথাটা না বললে আমি আর বাঁচব না। বিশ্বাস করো গত এক সপ্তাহ একেবারে ঘুমোতে পারি নি আমি। আমার ভেতরে যে কী হচ্ছে তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। এতবড় অন্যায়ের বোঝা বয়ে আমি আর একদিনও বাঁচতে পারব না কাজল। তুমি আমাকে বাঁচাও।

কাজল গম্ভীর হয়ে বলে, কী হয়েছে বলুন না?

—বল তুমি ক্ষমা করবে ?

—ক্ষমার যোগ্য হলে করব বইকি ?

ওর আন্তরিক আকুতি দেখে কাজল অবাক হয়ে যায় একটু।

মদনের গলাটা ভেঙে গেছে। কথা বলতে বলতে রাঙা চোখ-দুটো ওর স্তিমিত হয়ে আসে, তোমাকে এতদিন আমি সব মিথ্যে বলেছি কাজল। অজয়ের কথাই বলছি। তুমি যেদিন আমায় চিঠি লিখলে, তুমি আমায় ভাইয়ের মত ভালবাস। তার কয়েকদিন পরেই আমি অজয়কে বললুম, আমাদের বাড়ি আর আসিস নি। কাজলের দাদা সব জানতে পেরেছে।

শুনে মুখটা ওর সাদা হয়ে গেল। ঠিক মড়ার মুখের মত।

তোমার দাদাকে আমিই সব বলে দিয়েছিলাম। অজয়ের লেখা যে চিঠি কখানি ছিল, তোমার দাদাকে দেখিয়েছিলাম। সব শুনে তোমার দাদা এত ভীষণ রেগে গিয়েছিল যে তখুনি অজয়কে মারতে যেতে চেয়েছিল। কোনমতে তাকে থামিয়েছিলাম।

অজয়কে বলেছিলাম, ভীষণ মার খেতে হবে তোকে। আমাদের বাড়ির দিকেও আর যাস নি।

জান ত, ও এমনিতেই দুর্বল ভীরুগোছের ছেলে। শুনে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। শুধু বললে, কাজলকে মারবে না তো ?

বললাম, কাজল তো বলেছে ওর কোন দোষ নেই, সব দোষই তোর। ওকে আর মারবে না।

শুনে ও যেন একটু আশ্বস্ত হল। বাড়ি চলে গেল।

কাজল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মদন বলে চলেছে, তুমি যেদিন আংটিটা দিলে, আংটিটা ওকে দেখালাম। ওর মুখটা যে তখন কী রকম হয়ে গেল, তোমাকে আমি বলে বোঝাতে পারব না। চুপ করেই ছিল। একটা কথাও বলে নি।

দিনের পর দিন তোমার কথা বলতাম, ও কোন কথারই জবাব দিত না। ও যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। কারো সঙ্গেই ভাল

করে কথা বলত না। শুনতাম তখন নাকি দিনরাত পড়াশুনো করত।

একদিন শুধু একটা কথা বলেছিল। যেদিন তোমার চিঠিটা দেখালাম।

কাজল কেঁপে উঠল একবার। ঘামে ওর সর্বাঙ্গ ভিজে উঠেছে।

চুপ করে শুনতে লাগল।

মদনের গলাটা ভিজে, তোমার চিঠিটা দেখাতে চোখদুটো ও বুজল, আবার খুলল। তারপর একটু হাসল।

সে হাসির কথা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। তার চেয়ে যদি ও চিৎকার করে কাঁদত, তাও ভাল হোত। ওর সেদিনের হাসিটা আজও ভুলতে পারি নি।

বললে, তোকে ভালবেসে যদি কাজল সুখী হয়, হোক না। আমার আর কিই বা বলবার আছে। কুকুর হয়ে থাকতে আমার আপত্তি নেই, কাজল সুখী হলেই আমি সুখী।

একবার বললে, কাজলকে একবার দেখাতে পারবি?

বললাম, না, ভাই। সম্ভব নয়।

মুখটা নীচু করে চলে গেল। আর কখনও কিছু বলে নি।

কিন্তু দিনকয়েক আগে তোমার বিয়ের খবরটা যখন দিলাম, তখন ওর কী যে অবস্থা হল! এতদিনের এত আঘাত ও নীরবে সয়ে গেছে।

সেদিন কেন যে ছেলেমানুষের মত আমায় জড়িয়ে ধরল জানি নে। আমার হাতদুটো ধরে কেঁদে ফেললে। এই প্রথম ওর চোখে জল দেখলাম। বললে, তুই আমাকে একটু দয়া করলি নে মদন! আমি তোর কী করেছিলাম? তুইও তো কাজলকে বিয়ে করতে পারলি নে। আমাকে তবে কেন এমন করে মারলি? কেন আমায় মেরে ফেললি?

এখনও আমি ওর সে কান্না শুনতে পাচ্ছি। সেদিন থেকে

আমার ঘুম বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ঘুমোতে পারছি না। খেতে পারছি না।

আমি সহ্য করতে পারছি নে। আমার বন্ধুকে আমি নিজের হাতে মেরেছি। তোমাকেও মেরেছি।

তোমাদের দুটো জীবনকে আমি হত্যা করেছি।

ওর সেদিনের কান্না আমি সহ্য করতে পারছি নে। তুমি আমাকে ক্ষমা কর কাজল।

কাজল একবার মুখ তুলল। চোখ দুটো ওর গোলাপ ফুলের মত লাল।

চারদিকটা ওর অন্ধকার লাগছে। গায়েহলুদের হলুদ মাখা হাত দুটো আলসেয় ভর দিয়ে দাঁড়াল। সমস্ত দুপুরটা যেন ভীষণ-ভাবে স্তব্ধ হয়ে গেছে। রুদ্ধ হয়ে গেছে সংসারের সবটুকু ফাঁক। পায়ের তলায় কোন সাড় নেই।

মদনলালের গালের ওপর চোখের জল।

বললে, আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না?

কাজল আর একবার মুখ তুলল। ওর ভীষণ লাল মুখটা দেখে ভয় পেয়ে গেল মদন। শরীরের সবটুকু রক্ত কি ওর চোখে মুখে জড়ো হয়েছে?

বললে কাজল, না। এ জীবনে আপনাকে ক্ষমা করতে পারব না। আপনি দয়া করে আমার সামনে থেকে চলে যান।

মদনলাল ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে ছাদ থেকে নেমে যায়।

কাজলের বুকে আজ যে পাষাণ চাপিয়ে দিয়ে গেল মদনলাল, সে পাষাণ কি আর কোনদিন ক্ষয়ে যাবে? অজয়ের চোখের আতপ্ত জলের প্রতিটি ফোঁটা যেন বুকের ভেতর আগুনের বৃষ্টির ফোঁটার মত পড়ছে। পুড়িয়ে দিচ্ছে।

খর রৌদ্রের তীব্র তপ্ত ধুলো উড়ছে ছাদের এপাশে ওপাশে। ত্রিপলের বাঁশের ওপর বসে একটা কাক বোধ করি তৃষ্ণায় চিৎকার করে চলেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু ঘামতে থাকে কাজল।

মদনলালের ওপর রাগ করবার শক্তিটাও খুঁজে পায় না আর। ওর কী দোষ? ওর সবচেয়ে বড় দোষ ও কাজলকে ভালবেসেছিল। ওর ভালবাসায় সুতীব্র কামনা ছিল। কামনার ঈর্ষায় জ্বলে ও অজয়কে সরাতে গিয়ে যে কাজ করেছে, ওর মত অবস্থায় পড়লে যে কোন সাধারণ ছেলেই হয়তো ওই রকম একটা কিছু করে বসত।

ওর দোষ খুজে পায় না কাজল।

হয়তো অজয়কে শুধু সরিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হোত মদনলাল। আঘাত করতে চাইত না। কিন্তু বাধ্য হয়েই ওকে দিনের পর দিন অজয়কে আঘাত করতে হয়েছে, কাজলকে পাবার কামনার লোভে।

কামনার লোভ মানুষকে কোথায় নামিয়ে আনে, মদনলাল সেই কথাটাই কাজলের সামনে আজ তুলে ধরে গেল। বেচারী মদনলাল!

অজয়ের দোষও কিছুই খুঁজে পায় না কাজল। মনটাই ওর সুক্ষ্ম তারে বাঁধা। তাই সংসারের কোন কিছু নিয়ে কামড়া-কামড়ি করা অজয়ের স্বভাব নয়। যা পাওয়া গেল না, তা নিয়ে আর পাঁচজনকে বিব্রত করতে চায় নি। শুধু ভালবেসেই আনন্দ পেয়েছে।

তবে কি সব দোষই কাজলের?

নিজেকে বিচার করে দেখবার মত বুদ্ধি ওর নিজের নেই। ও ভেবেই পায় না, কী করলে ভাল হোত, আর কী করলে ভাল হোত না।

নিজের দিকে তাকিয়ে কাজল নিজেকে চিনতে পারে না। কোথায় যেন একটা অন্ধকার আবরণ রয়ে গেছে ওর চারদিকে।

ভেবে স্তব্ধ হয়ে যায় যে অজয়ের সবটুকু গ্লানি আজ নিঃশেষে ওকেই গ্রহণ করতে হবে।

এর চেয়ে বড় পরিহাস বোধকরি সংসারে আর কখনও চোখে পড়ে নি কাজলের।

পরিহাস! নিদারুন পরিহাসের কথা আজও ভাবছিলেন কাজল বসুমল্লিক। সেদিনও অজয় গাড়িটা থামিয়ে তাঁর সঙ্গে একটু পরিহাসই করে গেল। জবাব দিতে পারলেন না কাজল বসুমল্লিক। জবাব দেবার শক্তি তাঁর বহুকাল থেকে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

অনেক মানুষকে নিয়ে কাজ করেন তিনি। অনেকের ওপর নেতৃত্ব করেন। কিন্তু আজও আর একবার বুঝলেন যে একটা মাত্র মানুষের কাছে তিনি এখনও দুর্বল আর এ দুর্বলতা তাঁর নিজের তৈরী। যে জলে ডুবছেন, নিজে মাটি কেটে সে জল নিজেই সৃষ্টি করেছেন।

আশ্চর্য পরিহাস!

আজ গভীর রাত্রে বসে বসে শরীরটা বার বাব কেঁপে ওঠে কাজল বসুমল্লিকের। কী ছেলেমানুষিই না করেছিলেন তখন! অনেক ভুল করেছিলেন। সবচেয়ে বড় ভুল করেছিলেন অজয়ের ওপর মমতা করে, ওকে ভালবেসে।

ভালবাসা না ছাই!

কালো আকাশের দিকে চোখ তোলেন কাজল। ও সব ছেলেমানুষি। মারাত্মক ছেলেমানুষি।

এমন ছেলেমানুষের মত ভুল মায়াকে তিনি কিছুতেই করতে দেবেন না। কিছুতেই না।

খাটের উপর ঘুমন্ত মায়ার দিকে চোখ পড়ে।

মনে মনে কঠিন হাসি হাসেন কাজল বসুমল্লিক। মায়ার এ ঘুম যেন কখনও বন্ধ না হয়। আজ কাজল ঘুমোতে পারেন না, মাঝে মাঝে সমস্ত রাতই হয়তো জাগেন।

মায়ার যেন এমন বিষাক্ত রাত জাগতে না হয়।

জানলার ধারে বসে বসেও যেন হাঁপিয়ে ওঠেন কাজল। উঠে আবার পায়চারি করতে থাকেন ঘরে। মাথাটা দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে। একটু ঘুমও আজ হবে না।

ওষুধ না খেলে আর উপায় নেই।

ব্রোমাইড্ মিক্শ্চারের শিশিটা বার করতে হয়। খেতে হয় দু চামচ। এক চামচেও স্নায়ুগুলো অবশ করে দিতে পারে না ব্রোমাইড্।

আস্তে আস্তে গিয়ে মায়ার পাশে শুয়ে পড়েন।

ব্রোমাইডের ক্রিয়া শুরু হয় স্নায়ুর উপর। জোর করে অবশ করে দেয় উত্তেজিত ক্ষিপ্ত স্নায়ুগুলোকে।

ধীরে ধীরে চোখ বুজে আসে। ঘুমিয়ে পড়েন কাজল বসুমল্লিক।

পরদিনও মায়াকে পার্টির অফিসে নিয়ে গেলেন কাজল। সমীর রায়ের কাছে রাজনীতির গোড়ার কথা শিখছে মায়া। ক্রমে ক্রমে ভালই লাগছে মায়ার। তাঁরও প্রথম প্রথম খুব যে ভাল লাগত তা নয়। তার পর ধীরে ধীরে এত ভাল লেগেছে যে রাজনীতির এই কাজই তাঁকে বোধ করি জীবনের এত অজস্র কালিমা থেকে সরিয়ে রাখতে পেরেছে।

অনেকটা ভুলতে পেরেছেন অজয় আর—তাঁর স্বামীকে।

রাত্রিটায় মাঝে মাঝে ওদের দুজনের কথা তাঁকে বড় জ্বালায়। অনর্থক জ্বালায়। তাই মাঝে মাঝে অনেক রাত পর্যন্ত পার্টির কাজ করেন কাজল।

মায়া নিয়মিত পার্টি অফিসে যাচ্ছে। এখন একাই যায়। সঙ্গে করে আর নিতে হয় না। ফেরবার পর আজ কতটুকু শিখেছে সেটুকু পরখ করে নিতে হয় কাজলকে। মায়া খুব যে গড়গড় করে বলতে পারে তা নয়। তবু কিছু কিছু বলতে পারে।

মাস দেড়েক কেটেছে। মায়া রোজ বিকেলে পার্টি অফিসে যায়। কাজল খুব খুশী হয়ে ওঠেন। মেয়েটার নিশ্চয়ই যেন ভাল লাগছে, লাগবেই তো! রাজনীতির মত এমন একটা নেশা পৃথিবীতে খুব কম আছে।

এতে মত্ততা আছে, উত্তেজনা আছে, আনন্দ আছে।

এ নেশা যে একবার ধরেছে, তার আর কিছুই ভাল লাগে না। পার্টিই তার জীবনের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। এতে নাম

আছে, যশ আছে, আধিপত্যের অসাধারণ লোভ আছে। মানুষের তৈরি এমন একটি নেশার তুলনা বোধ করি পৃথিবীতে আর মেলে না।

কাজল বসুমল্লিকের এই উত্তেজক অভিজ্ঞতা আছে। এ নেশায় তিনি অজয়কে ভুলেছেন, স্বামীকে ভুলেছেন। স্বজনদের ভুলেও থাকতে পারছেন, তা নইলে কি বাঁচতে পারতেন ?

সেদিন খুশি-মনে পার্টির অফিসে যান কাজল। মায়া তাঁর আগেই চলে গেছে একা একা। অফিসে গিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলেন। কয়েকটি বিষয়ে মতভেদের জন্যে কার্যকরী সমিতির সভায় আলোচনা করেন।

সভানেত্রীর মর্যাদা নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আলোচনায় একটা মীমাংসাও করবার চেষ্টা করেন। সভার পর লাইব্রেরি-ঘরের ভেতরে যান সমীরের খোঁজে। মায়াকে দেখতে। আজ ওকে নিয়ে একসঙ্গে সকাল সকাল ফিরবেন।

গিয়ে দেখেন সমীর রায় বসে আছে। সামনে একটা মোটা বই তুলে। কিন্তু মায়া নেই ওখানে। মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে।

—সমীর !

—আজ্ঞে ? উঠে দাঁড়ায় সমীর রায়।

—মায়া কোথায় ?

—তাই তো ! উনি তো এই মাত্তর আসছি বলে ওদিকে গেলেন।

—কোথায় ?

—ওই ঘরের দিকে।

—ও ঘরের দরজা তো বন্ধ।

—হ্যাঁ, মানে ভেতরে গানের ইয়ে হচ্ছে কিনা।

—গান !

মুহূর্তে মুখখানি লাল হয়ে ওঠে ওঁর।

ভ্রূ কুঁচকে বলেন, কার গান ?

সমীর রায় মাথা চুলকোয়ঃ ওই যে কী বলে, সুব্রত। ওই যে নতুন ছেলেটিকে পার্টি-মেম্বার করা হয়েছে, ও-ই তো গাইবে, সামনের রোববার হাওড়ার মিটিংয়ে গাইবে।

—হুঁ।

কাজল বসুমল্লিক অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছেন। সমীর রায় ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কাজল এগোন ঘরের দিকে।

বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে সত্যিই সুর কানে ভেসে আসে।

'যাত্রা হল শুরু, ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার।'

দোর ঠেলে দেন কাজল বসুমল্লিক। ভেজানো দোর খুলে যায়। ভেতরে তিন-চারটি ছেলে আর মায়া। চমকে ফিরে তাকায় ওরা। সবাই স্তব্ধ শঙ্কিত হয়ে ওঠে কাজল বসুমল্লিকের কুঞ্চিত ভ্রূ দেখে।

শুধু হয় না একজন। সেই নতুন ছেলেটি—সুব্রত নাগ।

কাজলের দিকে একবার তাকিয়ে পরমুহূর্তে বলে, গাও। থামলে কেন ?

কেউই আর গায় না।

কাজল ভাল করে দেখেন ছেলেটিকে। বেশ লম্বা স্বাস্থ্যবান ছেলে। ধবধবে গায়ের রঙ। গ্রীসিয়ান ভাস্করের মূর্তির মত উন্নত নাক আর চওড়া চিবুকের মাঝে একটা ভাঁজ। হাতের কব্জি দুটো চার ইঞ্চির ওপর চওড়া।

—মায়া, এদিকে এস। গম্ভীর গলা শোনা যায় কাজলের।

সুব্রত নাগ হারমনিয়ামের সামনে থেকে উঠে আসে।

দ্বিধাহীন সহজ গলায় বলে, ও কী করে যাবে মাসীমা ? ও যে আমাদের সঙ্গে গাইবে।

কাজল চোখ দুটো বড় বড় করে তাকান। সুব্রত নাগ একটুও ভয় পায় না।

কাজলের মন্দ লাগে না ছেলেটিকে। বেশ সাহসী, শক্তিমান।

—গান গাইতে তো ও জানে না, বললেন কাজল।

সুব্রত হেসে বলে, কী যে বলেন, এমন সুন্দর গলা মায়ার!

মায়া রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। সুব্রত এমন সহজ ভাবে এমন সব মারাত্মক কথা বলছে! মা যে বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাকে কী করবে!

—ওকে আমরা ছাড়তে পারব না মাসীমা। সুব্রতর গলার জোরটা একটুও কম নয়।

কাজল বসুমল্লিক একটু অবাক হন। ছেলেটার সাহস তো কম নয়!

ওকেই জিজ্ঞেস করেন, কতদিন পার্টির কাজ করছ?

নিখুঁত ঠোঁট দুটি ফাঁক করে একটু হেসে বলে সুব্রত, আপনি যতদিন হল সভ্য করে নিয়েছেন।

—হুঁ! কাজল ভেতরে ভেতরে জ্বলে ওঠেন। কিন্তু মুখে বেশী রাগ দেখানোটা এখানে ঠিক হবে না। এ-ও রাজনীতিরই কুটিল শিক্ষা।

বলেন, তুমি কি গান গাইতে পার?

—এতক্ষণ তবে কী শুনলেন?

কাজল বসুমল্লিক তিক্ত কণ্ঠে ডাকেন আর একটি ছেলেকে: শোন, অনন্তবাবুকে বলে দিও হাওড়ার মিটিংয়ের আগে গান হবে না। কোনও মিটিংয়েই হবে না।

অনন্তবাবু সহ-সম্পাদক। মিটিংয়ের ভার তাঁর ওপরই। ছেলেটি ঘাড় নাড়ে।

সুব্রত নাগের মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে।

দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আপনি একা বললে তো হবে না। আমি একজিকিউটিভ বডির কাছে আপিল করব, সেখানে কথাটা ভাল করে বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

কাজল বসুমল্লিক ছেলেটির সাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান।

—কী প্রয়োজন না-প্রয়োজন সেটা তোমার মুখ থেকে আমার শোনবার প্রয়োজন নেই। মায়া, চলে এস।

মায়ার বুক কাঁপছে। হাত পা কাঁপছে। গুটিগুটি চলে আসে মায়ের কাছে। কাজল মায়াকে নিয়ে বাড়ি ফেরেন।

রাস্তায় মাত্র কয়েকটা কথা বলেন মায়ার সঙ্গে।

—সুব্রতর সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ ?

ঢোঁক গিলে বলে মায়া, দিন পনেরো।

—হুঁ, আমি আশা করেছিলাম সমীরের কাছেই তোমাকে আজ পড়তে দেখব।

মায়া নীরব।

—কাল থেকে সমীরের কাছে যাবে, সেখান থেকে আর উঠবে না।

—আচ্ছা। ঘাড় নাড়ে মায়া।

আর একটা কথাও বলেন না কাজল বসুমল্লিক। বাড়ি এসেও আর কথা বলেন না।

পরদিন থেকে মায়া সমীরের কাছ থেকে আর ওঠে না। সমীরকে বলে দিয়েছেন কাজল, ছাত্রীকে সামলাতে হয় সমীর। ও ফাঁকি দিতে চাইলেও তুমি ওকে ছাড়বে না। এইবারে লেবার অ্যাণ্ড মনি সম্বন্ধে ওকে ভাল করে বোঝাও। কঠিন বিষয়। বুঝতে বুঝতেই সময় কেটে যাবে।

সমীর হেসে ঘাড় নাড়ে।

কাজল বলেন, কোথাও পালালে তুমি ধমক দিও, নয়তো আমায় বলে দিও।

সমীর আবার ঘাড় নাড়ে।

দিনকতক কাটে। সমীর খুব বোঝাতে শুরু করেছে মায়াকে। লেবার মানে কী ? পরিশ্রম মানেই টাকা। ধনীরা টাকা এক্সপ্লয়েট করে মানে হচ্ছে গরীবের লেবার মানে শ্রম ঠকিয়ে নেয়।

মায়া ঘাড় নাড়তে থাকে। ধনী, টাকা, এক্সপ্লয়েট, কথাগুলো একটু একটু মুখস্থ হয়।

মাঝে মাঝে সমীরের বোঝাবার চাপে বুঝতে গিয়ে ঘেমে ওঠে।

সেদিন সমীর আটটায় ছেড়ে দিয়েছে ওকে।

ও হাতের থলেটা নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমেছে, দেখে একেবারে সামনে সুব্রত।

সুব্রত সহজ হেসে বলে, কী হল ? মা কি কথা বলতেও বারণ করলেন ?

মায়া মাথাটা নিচু করে চলে যেতে চায়।

সুব্রত ছাড়ে না : শোন, তোমার মায়ের নাম শুনেছি কতদিন থেকে। তাঁকে মনে মনে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর সেদিন সন্ধ্যার ব্যবহারটার কোনও মানেই খুঁজে পেলাম না। তুমি কিছু বলতে পার ?

—না। বলে মায়া হাঁটতে শুরু করে।

সুব্রত নাগ ওর পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে, চল না, কোথাও একটু বসি।

মায়া ফিরে তাকায় : আপনি আমাকে 'তুমি' বলে এমন ঘনিষ্ঠ ভাবতে থাকলেন কী করে! আমি তো তেমন কোনও সুযোগ আপনাকে দিই নি।

সুব্রত নাগ হাসে : আমার চেয়ে বয়েসে ছোট হলে মেয়েদের আমি কখনও 'আপনি' বলি না। তা ছাড়া মনটা আমার এতই বিশাল যে এখানে জায়গা পেয়ে ঘনিষ্ঠ হতে কারও বেশী দেরি হয় না। ছোট মন হলে পর করেই রাখতাম।

ওর বলবার ভঙ্গি এত সহজ আর এতই সবল যে মায়া হেসে ফেলে : সত্যি, আপনার সঙ্গে আলাপ যে এত শিগ্‌গির কী করে এত ঘনিষ্ঠ হল আমি ভেবে পাই নে।

—কারো কারো সঙ্গে এমন হয়। চল, ওই মাঠে একটু বসা যাক।

—আজ নয়।

—কেন, ভয় করছে? আমিও পাপী-তাপী মানুষ নই। আর তুমিও চুরি-ডাকাতি করছ না। বসে বসে একটু কথা বলা, তার অত ভয়টা কিসের?

ম্লান হেসে মায়া বলে, না, ভয় আর কী? আজ নয়।

—তবে কাল নিশ্চয়!

—হ্যাঁ, কিন্তু যদি একটা গান শোনান কাল। গান আমি এত ভালবাসি, অথচ মা—

বলতে গিয়ে থেমে যায় মায়া।

সুব্রত বলে, মার কথা থাক্। গান আমি শোনাব। শিখতে চাও শেখাতেও পারি, তোমার গলা কিন্তু ভারি মিষ্টি।

—কোথায় শেখাবেন?

—কেন আমাদের বাড়িতে?

—আপনার বাড়ির কারোও—

হো-হো করে হেসে ফেলে সুব্রতঃ ভয় নেই। বাড়িতে আমার বোন আর একটা ভাই। বোন মাস্টারি করে, বড় ভাল মেয়ে। আমিও মাস্টারিই করি, তবে কলেজে।

—তবে তো বেশ ভাল হয়।

বলেই মনে হয় মায়ার, কিন্তু যাবে কখন? সুব্রতর কাছে যাবার সময় পাবে কি করে?

সুব্রত যেন মনের কথা পড়তে পারে। বলে, যেদিন গান শিখতে ইচ্ছে হবে, কলেজে না গিয়ে আমাদের বাড়ি চলে এসো। আর আগে একটু বোল, আমিও যাতে কলেজে না যাবার চেষ্টা করতে পারি।

মায়ার কেমন একটা সঙ্কোচ হয়ঃ কিন্তু এ কেমন যেন—

দরাজ গলায় হাসে সুব্রতঃ তুমি তো কোনও অপরাধ করছ না। দুটো ভাল গান শিখতে যাবে, এতে আবার কিন্তু কী?

মায়া নিজে নিজেই ভাবে, তাই তো, দুটো গান শিখতে যাওয়া,

এতে তো অন্যায় কিছু থাকতে পারে না। তবে আর অত ভয়ের কী!

ভয় করে করে ভয় পাওয়াটাই বোধ হয় ওর অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। নিজের মনেই হাসি পায় মায়ার। সুব্রতর কথায় ওর ভয়ের ভাবটা একটু একটু যেন কাটছে।

কথায় কথায় অনেকটা পথ এসে গেছে ওরা।

মায়া হেসে বলে, আচ্ছা, আজ চলি।

—কাল ঠিক দেখা হবে?

—দেখি মানে—

মায়া ইতস্তত করে আবার। মায়ের কঠিন মুখখানা মনে পড়লেই ও যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ করে অকারণে।

—মানেটানে নয়। ঠিক আটটায় বাইরে না এলে, সমীরচন্দ্রর কাছ থেকে ধরে আনব। খুব মন-খোলা হেসে ওঠে সুব্রত নাগ।

কী ডাকাত ছেলে সুব্রত! মনে মনে ভয় পেয়ে যায় মায়া। কথা না বলে বাড়ি চলে যায়। বাড়ি গিয়ে সোজা নিজের ঘরে। চাকরটাকে জিজ্ঞেস করে শোনে, মা খানিকক্ষণ আগে পার্টি অফিসে গেছে।

—কটায়?

—সোয়া আটটায়।

যাক। বাঁচা গেছে। শাড়ি পালটে হাত মুখ ধুয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়ে মায়া।

সুব্রতকে ও যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

ব্যবহারে এতটুকু খাদ নেই। কথায় একটু মিথ্যে নেই। দু-কথায় মানুষকে দু হাতে কাছে টেনে নেয়। তার ভেতরে কিছুমাত্র উদ্দেশ্য থাকে না। মায়ার সম্বন্ধে সুব্রতর ব্যবহারও এত সহজ আর বলিষ্ঠ যে ও সুব্রতর সামনে যেন ভাল করে কথাই বলতে পারে না। অথচ সুব্রতর অস্বাভাবিক ব্যবহারে কিছুমাত্র অন্যায়ভাব দেখতে পায় না।

ও যেন ছুনিয়াটাকে তুড়ি মেরে হাঁটতে হাঁটতে চলছে। আশ্চর্য ছেলে এই সুব্রত নাগ। ওর কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে যায় মায়া। বিভোর হয়ে যায়।

পরদিন সন্ধ্যায় সমীর রায় কিছুতেই ছাড়ে না। হাতের ছোট হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে উসখুস করে মায়া। সমীর রায় কিছুতেই ছাড়বে না। এই লেবরকে কী করে কণ্ট্রোল করে ধনীরা। ধনীদের সাহায্য করে মধ্যবিত্ত দালাল শ্রেণীর মানুষ।

এইখান থেকে সমীর রায় সোজা চলে আসে ইনফ্লেশনের প্রশ্নে। টাকা বেড়ে যায়। মানে কী?

—উঃ! মাথাটা বড় ধরেছে সমীরদা।

হাতঘড়িটায় দশ মিনিট আগে আটটা বেজে গেছে।

সুব্রত নাগের চেহারাটা দরজার সামনে দেখে ভয় পায় মায়া। যদি সত্যিই সমীরের কাছে চলে আসে সুব্রত?

—ভীষণ মাথা ধরেছে।

সমীর থেমে গিয়ে বলে, কিন্তু এমন ইনটারেস্টিং জায়গাটা—

—কাল হবে সমীরদা। আজ চললুম। আর বসতেই পাচ্ছি না।

সমীরের উত্তরের অপেক্ষা না করেই উঠে পড়ে মায়া। সোজা দরজার সামনে চলে আসে। সমীর রায় কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা বই টেনে নেয় সামনে।

মায়া বেরিয়ে সোজা পথ ধরে।

সুব্রত পিছন পিছন।

সুব্রতর ওপর রাগ হয় মায়ার। এমন ডাকাতের সঙ্গে আলাপ করাও বিপদ। শেষকালে কী ফ্যাসাদে যে ফেলবে কোন সময়! ও যে কাউকেই গ্রাহ্য করে না। মাকেও না।

—আর একটু দেরি হলে—

মায়া চটে গিয়ে বলে, গিয়ে হিড়হিড় করে টেনে আনতেন এই তো? সব আপনার জুলুম!

সুব্রত অবাক হয়ে বলে, বাঃ! জুলুম তো করছ তুমি! গান শোনাতে হবে, গান শেখাতে হবে!

—গান শুনতে চাই না। আমার মাথা ধরেছে।

—আমার গান শুনলে মাথা ধরা ছেড়ে যায়।

—ও সব কথা চার বছরের খুকীকে বলবেন।

—বেশ, বিশ্বাস না হয়, বাজি ধরো, পরখ করে দেখ।

মায়া একটু চটে যায়ঃ দেখুন কী পেয়েছেন বলুন ত? আপনার কথাবার্তাগুলো এত অভদ্র। যদি না আসতুম, আপনি কী করতেন শুনি? গিয়ে সমীরদা'র কাছ থেকে টেনে নিয়ে আসতেন? টেনে নিয়ে আসতেন মানে কী? টানাটানি আবার কি রকম ভদ্র কথা। আপনাকে ভয় করে চলতে হবে নাকি?

সুব্রত হেসে ওঠে।

—হাসছেন মানে? আপনি কি গালাগালও গায়ে মাখেন না?

সুব্রত হাসি মুখেই বলে, মাখি। তোমার মায়ের একটু কথাও গায়ে লাগে। কিন্তু তোমার নয়।

—তার মানে? আমাকে আপনি গ্রাহ্যই করেন না?

—তোমাকে কি গ্রাহ্য করতে হবে নাকি?

মায়া খুব রেগে যায়ঃ নাঃ, আপনি এক অসহ্য মানুষ।

—দোষটা আমার নয়। তোমার সহ্য করবার ক্ষমতাটাই কম। এইটেই প্রমাণ করছ যে তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। তোমাকে গ্রাহ্য করার কোন প্রয়োজন নেই।

—তাই বলে টেনে আনবেন মানে?

—টেনে আনব না তো কি বেঁধে আনব বললে ভাল হোত?

মায়া অন্য পথ ধরে। সুব্রত দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, ওদিকে কোথায় চললে?

—বাড়ি যাব। মাথা ধরেছে। মায়াও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখে সুব্রত দাঁড়িয়ে আছে। পেছন পেছন আসছে না দেখে নিজেই আবার দাঁড়িয়ে পড়ে।

কী একটু ভেবে আবার ফিরে আসে।

সুব্রতকে গম্ভীর হয়ে বলে, বলতে এলুম। যা বলেছি তার জন্যে কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা চললুম।

সুব্রত ডাকে, দাঁড়াও।

—ডাকলেন যে আবার?

—আমারও একটা কথা ছিল।

—কী। তাড়াতাড়ি শেষ করুন। দাঁড়াবার সময় নেই।

—বলছিলাম কি আমার কোন অন্যায় কিছু হয় নি। তোমাকে খুব ভাল ভাল কথাই বলেছি। তুমি ইচ্ছে করলে অনেক কিছু মনে করতে পার।

মায়া হেসে ফেলে এতক্ষনে।

—হাসলে যে?

—হাসব না তো কী করব? আপনার কথা শুনে কি কাঁদতে বলেন নাকি?

—এতক্ষণ তো হাসতেই বলছিলুম। চলো ওই ছোট মাঠটায় বসি।

—না, মাঠে নয়।

—তবে কোথায়? আমার বাড়িতে যাবে? তবে খুব খুশি হই।

—আপনি খুশি হলে কিছুতেই যাব না। বাব্বা! খুশি না হয়েই ডাকাতপড়া ভাব। খুশি হলে ত সত্যিই ডাকাত পড়বে।

—ডাকাত কথাটা আমাকে আর একজন বলত।

—কে?

— আমার মা।

ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে সুব্রত। মায়াও চলছে পাশে পাশে।

মায়ার স্বরটা নরম হয়ে এসেছেঃ আপনার মা এখন কোথায়?

—নেই। অনেক দিন আগেই মারা গেছেন।

—বাবা ?

—বাবাও নেই! বললাম যে আমি আর আমার ছোট একটা বোন আর একটা ভাই। আমরা তিনজন থাকি।

—বেশ আছেন, একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে মায়ার, মা থাকা যে কী জ্বালা। না থাকলে বোধহয় একরকম ভালই হোত। আর সহ্য হয় না আমার।

সুব্রত কথা পালটায়, তোমার মাথা ধরা সেরেছে ?

—হ্যাঁ।

—গান না শুনেই সেরে গেল ?

—আপনিই ত একটা আস্ত গান। দরাজ গলার দ্রুত লয়ের গান।

হেসে ওঠে সুব্রত : বাঃ! চমৎকার!

—কী ?

—তোমার এই কথাটা। এমন একটা উপমা সহসা শোনা যায় না।

—উপমাটা আপনা আপনিই এল। তৈরী করা উপমা কিন্তু বড় নীরস লাগে।

—তুমি এত সুন্দর কথা বলতে পার তা জানতুম না।

—কতটুকুই বা জানেন আমার কথা।

—বেশী জানবার আর কি আছে ?

—আছে। বাইরে থেকে দেখেন, এমন নামকরা মায়ের একমাত্র মেয়ে। কত আদর কত যত্ন। কিন্তু আমার কষ্ট আমিই জানি। সে কথা অন্য কাউকে বোঝান যাবে না।

সুব্রত নাগ একটু ভাবে। মায়ার কথাগুলো ছেলেমানুষি আবেগে ভরা তবু কোথায় যেন একটা বেদনার সুর ধরা পড়ে। সুব্রত কথাটা চাপা দেবার জন্য বলে, দেখ, সংসারে কষ্ট নেই, এমন একটা মানুষ আমায় দেখাতে পার ? আর সব চেয়ে মজা এই যে সবাই মনে করে আমার চেয়ে কষ্ট আর ত্রিভুবনে কারো নেই।

মায়াও কথাটা পালটায়ঃ ওমা, আবার যে উলটে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পার্টি অপিসের কাছে এসে পড়লুম। বেশ মানুষ তো আপনি ?

সুব্রত হাসে ঃ চলো, তবে ফিরি। তোমাকে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে আসি।

—চলুন। একটু পা চালিয়ে। কত রাত হল বলুন ত ?

—হোক না।

—বারে বা ! হাজার হোক—।

—মেয়ে মানুষ তো ? তোমরা আজকের দিনেও যদি এ সব কথা বলো, তবে ত আর কোন জন্মেই তোমাদের কিছু হবে না দেখছি।

মায়া হাসে ঃ তা বোধহয় হবে না। নইলে আপনি দিব্যি আমিরী চালে আমাকে ধমকান, আর আমি কিছু বলতে পারি না !

কেন পার না ?

ওই তো মেয়ে বলে।—হাসতে থাকে মায়া।

সুব্রত মুখটা গম্ভীর করে বলে, এটা কিন্তু ঠিক নয়। আমি তোমাকে মেয়েও ভাবি না, ছেলেও ভাবি না, বন্ধু বলে ভাবি। তুমিও কি কম ধমকালে নাকি ?

মায়া হেসে ফেলে এবার, আজ খুব রেগে গিয়েছিলাম।

—কেন বল তো ?

—আর বলেন কেন। সমীরদার ইনফ্লেশন-য়ের বক্তৃতা শুনতে শুনতে এমন বিশ্রী লাগছিল ! বার বার বলছেন, ইনফ্লেশন তৈরী করে ধনীরা। কমোডিটির অভাব সৃষ্টি করে নিজেরা ইচ্ছে করে, তারপর যেন কি ? বাব্বা ! জীবন যায় !

সুব্রত বলে, কিন্তু ওগুলো কিছু কিছু জানা দরকার। সমীর ঠিক বোঝাতে পারে না তোমায়। তার চেয়ে তোমার মাকে বল, আমি তোমায় শেখাব।

—সমীরদা কত পড়াশুনো করেন ? আপনি কী জানেন শুনি ? বকবক করতে জানেন আমার সঙ্গে।

সুব্রত বলে, তা হলে তোমাকে সবিনয়ে বলতে হচ্ছে, কলকাতার একটা মস্ত কলেজে অর্থনীতি আর রাজনীতি দুটোই আমি পড়িয়ে থাকি।

—ছাই পড়ান।

—ছাই পড়াই বললেই হল! কলেজে কি এমনি এমনি আমায় মাইনে দেয়?

মায়া মুখ টিপে হাসে, আপনার কথার যা বহর, মাইনে না দিয়ে যাবে কোথায়?

—যাচ্চলে! বেশত আমার কাছে দুদিন শিখে দেখই না?

—মা রাজী হবেন কেন?

—রাজী না হবার তো কারণ দেখছি নে।

—যথেষ্ট কারণ আছে। আপনি অন্ধ তাই দেখতে পান না। অনেক কিছুই দেখতে পান না।

সুব্রত একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে চলতে চলতে: হয়তো হবেও বা। আমি কোন কথাই খুব তলিয়ে ভাবি নে। কিন্তু সমীরের কাছে তোমার পড়ায় আপত্তি করেন না কেন?

মায়া হেসে ওঠে: কী যে বলেন! সমীরদা কি একটা পুরুষমানুষ!

বলে ফেলেই লজ্জিত হয়ে পড়ে। এমন একটা কথা হঠাৎ বলা তার ঠিক হয় নি।

সুব্রত হেসে ফেলে, তবে কী?

—ও তো একটা লাইব্রেরি।

বলে আরও লজ্জিত হয় মায়া। তারপর প্রায় হঠাৎই বলে, আচ্ছা, আপনি তা হলে যান। বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি।

—আচ্ছা চলি। বলে সুব্রত কি ভাবতে ভাবতে রাস্তার উলটো পথ ধরে।

মায়া বাড়িতে চলে আসে। সুব্রত চলে যেতে মায়ের মুখটা ওর মনের ওপর ভেসে ওঠে। মন সংকুচিত হয়ে ওঠে অকারণ

আতঙ্কে। দ্রুতপায়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে নিজের ঘরে চলে আসে। শাড়ি পালটে চেয়ারে বসে বইটা খুলে তার ওপর চোখ বোলাতে থাকে। পড়তে কিছু পারে না। তবু দেখাতে হবে যে সে পড়ছে।

চাকরটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে মা বাড়ি ফেরে নি।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সুব্রতর চিন্তাটাই ওর মনে আনাগোনা করে। কত সরল কত বলিষ্ঠ মানুষটা। সুব্রতর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ওর নিজের মনের শক্তিটাও আবিষ্কার করতে পারে। একটুও আতঙ্ক থাকে না মনে। একটুও ভয় করে না। সুব্রত যেন ওর জীবনে এক বলিষ্ঠ ভরসার মত মনে হয়।

কাউকে গ্রাহ্য করে না। কিছু পরোয়া করে না। সজোরে হাসতে পারে, সশব্দে প্রতিবাদ করতে পারে। মায়া যেন এতকাল এমনি একটি মানুষের প্রতীক্ষাই করছিল।

কিন্তু তার প্রতীক্ষা কি কোন কালে সফল হবে? মায়ের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির জালের ভেতর থেকে সে কি সুব্রতর দিকে কখনও হাত বাড়াতে পারবে? সুব্রত কি ওর চওড়া হাতখানা বাড়িয়ে চেপে ধরে নিজের কাছে টেনে নিতে পারবে কোনদিন?

ভীতু পাখীর মত ধুকধুক করে মায়ার বুক। যদি না পারে? তাকে কি আরও অনেককাল সহ্য করতে হবে মায়ের এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের চাপ। এ চাপে ও দিনদিন কুঁকড়ে পিষে পাণ্ডুর হয়ে যাচ্ছে। ও বাঁচবে কি করে?

—খুকি!

হঠাৎ মায়ের ডাকে সোজা হয়ে বসে মায়া। বইয়ের দিকে চোখ রেখে ঠোঁট দুটো নাড়তে থাকে, যেন পড়ছে।

—তোমার কি মাথা ধরেছিল, সমীর বললে?

মায়ার মাথা ধরে নি। মিছে কথা বলে সমীরের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল।

তবু বলতে হয়, হ্যাঁ।

—তবে পড়ছ কেন?

কাজল বসুমল্লিক ভ্রূ দুটো কোঁচকালেন।

মায়া তক্ষুনি কোন উত্তর দিতে পারে না। ভয়ে ভয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় মায়ের দিকে।

—পড়তে হবে না আজ।

কোন কথা না বলে বইটা বন্ধ করে মায়া। তবু যদি এইখানেই মায়ের জেরা শেষ হয়।

—কোন ওষুধ খেয়েছিলে?

হাতের ব্যাগটা থেকে দুটো বড়ি বার করে বলেন কাজল, এই নাও। এই ট্যাবলেট দুটো খেয়ে ফেল।

মহা বিপদে পড়ে যায় মায়া। মিছিমিছি দু-দুটো ট্যাবলেট খাওয়া! মাথা তো ওর একটুও ধরে নি।

ও খুব সাহস করে একবার বলে, একটা খাই মা।

—না। দুটোই খাও। খেয়ে ফেল।

এ কথা অমান্য করার মানে কী মায়া ভাবতেও পারে না। ভগবান স্মরণ করে যা থাকে কপালে বলে ট্যাবলেট দুটো হাতে নেয়।

কাচের গেলাসে জল গড়িয়ে দেন কাজল।

—নাও জল নাও।

জল মুখে দিয়ে ট্যাবলেট দুটো মায়াকে গিলেই ফেলতে হয়। একটু প্রতিবাদ করতেও পারে না

ভাবে, এর পরে হয়তো মা চলে যাবেন।

না। যাবার কোন লক্ষণ নেই।

কাছে এসে কাজল বলেন, আজ আর রাত্তিরে কিছু খাবার দরকার নেই।

ভীষণ বিপদ! খিদেতে মায়ার পেট জ্বলে যাচ্ছে। এমন জানলে বাইরে থেকে সে কিছু খেয়ে আসত, ও আর একবার কোনমতে সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলে, বড্ড খিদে পেয়েছে মা।

—তা হোক। কিছু খাবার দরকার নেই। শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

মায়া প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে চুপ করে বসে থাকে।

কাজল বসুমল্লিক ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

মায়ার সমস্ত রাগটা পড়ে সুব্রতর ওপর। এই মানুষটার জন্যেই তার এই অবস্থা। খিদেয় পেট জ্বলছে। ট্যাবলেট দুটো পেটে গুলোচ্ছে। মাথাটা যেন এবার সত্যি সত্যিই ধরতে শুরু করেছে। না! আর দরকার নেই। সুব্রতর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলে হয়তো আরও এমনি কত বিপদ হবে কে জানে। ও পরিষ্কার বলে দেবে, তার সঙ্গে সে কথা বলতে চায় না।

আর বলবারই বা কি দরকার! নিজে কথা না বললেই মিটে গেল।

পরদিন সন্ধ্যায় সমীরের কাছে পড়া শেষ করে কোনদিকে আর না তাকিয়ে রাস্তায় চলে আসে মায়া। সুব্রতকে আজ পার্টি অপিসে দেখাই গেল না। গেল কোথায় মানুষটা? যাকগে যেখানে খুশি! তার বয়ে গেল।

সমীরদার পড়ানর কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই ও ট্রামের দিকে এগোতে থাকে।

আজ সমীরদা বোঝাচ্ছিল, ব্যাঙ্ক ন্যাশান্যালিজেশন। এই ব্যাঙ্ক গুলোই ধনী-সম্প্রদায়ের দালাল।

ধনীদের অনন্ত কুকাজের ভাণ্ডার। 'হোর্ডিং' থেকে শুরু করে টাকা 'ওভার ড্রাফ্‌ট্‌' দেয়া পর্যন্ত সব কিছুই এই ব্যাঙ্কের কাজ। 'কমোডিটি'র কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণভাবে ধনীদের সাহায্য করে ব্যাঙ্কাররা। ব্যাঙ্কগুলো যদি রাতারাতি 'ন্যাশান্যালাইজ' করা

যায়, তাহলে সোশ্যালিজ্‌ম-য়ের দোর গোড়া পর্যন্ত পৌঁছন সম্ভব হতে পারে। নইলে 'ট্যাক্স' বাড়ান বৃথা চেষ্টা। ওতে ধনীদের জব্দ করা অসম্ভব। বরং উলটে গরীবদের অসুবিধেই ওতে বেশী হয়।

সত্যি। আশ্চর্য এই 'ব্যাঙ্ক'গুলোর ক্ষমতা!

—কে?

চমকে ওঠে মায়া। পেছন থেকে হাত ধরেছে সুব্রত। হাসছেও।

—কোথায় চললে?

মায়া হাত ছাড়িয়ে নেয়। আচ্ছা লোক তো। একেবারে সোজা এসে হাত চেপে ধরা!

যেখানে খুশি।

—কী হল তোমার?

—আপনি কি আমায় মেরে ফেলবেন ঠিক করেছেন? মায়া ফোঁস করে ওঠে।

সুব্রত একটু হকচকিয়ে যায়, কী হল বল তো?

—কাল তো না খাইয়ে রেখেছিলেন সমস্ত রাত। আবার মিছিমিছি ছুটো কড়া ট্যাবলেট খেয়ে মরি।

—আমি! সুব্রত ভীষণ অবাক হয়।

—আপনি নয় তো আবার কে? যান, যান। নিজের কাজে যান।

সুব্রত বলে, দরাজ দৃঢ় গলায়, এখন আমার তোমার কাছে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। চল ওই চায়ের দোকানটায় ঢুকি।

—হ্যাঁ, শেষকালে আজও আমি মরি আর কি?

সুব্রত ওর হাতটা ধরে, চল।

রাস্তায় তো আর বেশী কথা বলা চলে না। নইলে মায়া দেখে নিত একচোট। ধীরে ধীরে দোকানটার দিকে যায়।

মায়া বলে, না। দোকানে নয়। মাঠে চলুন।

—চল।

রাস্তার ওপরেই পার্কটা। এক কোণে গিয়ে ঘাসের ওপর বসে ওরা। রাত একটু হয়েছে, তাই পার্কটা নির্জন। দু একটা মানুষ এধারে ওধারে। পামগাছের নীচে গেটের সামনে শুধু চানাচুর বাদামওলাটা বসে কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালিয়ে।

—কী হয়েছিল কাল রাত্তিরে? জিজ্ঞেস করে সুব্রত।

মায়া কালকের সমস্ত ঘটনাটা বলে।

শুনতে শুনতে সুব্রত হাসতে হাসতে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

—আপনি তো হাসছেন। খিদেয় আমার কাল রাত্তিরে ঘুম হয় নি।

—তা বললুম তো ওই দোকানটায় বসে চপ কাটলেট মাংস পেটপুরে খেয়ে নিলেই হত।

মায়া চটে যায়ঃ আমার দোকানে যাবার দরকার নেই। খাবারও দরকার নেই। আপনি আমার কাছে আসা আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করুন দয়া করে। তা হলেই আমি বাঁচি।

—সত্যি বাঁচ?

—সত্যি বাঁচি।

সুব্রত নির্বিকার মুখে উঠে পড়েঃ আচ্ছা তবে চললুম।

পিছন ফিরে উঠতে গিয়ে জামাটায় টান পড়ে। সুব্রত ফিরে তাকায়। মায়া ওর দিকে অসহায় দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

সুব্রত নাগ ভ্রূ দুটো কুঁচকে বসে পরে। ভাল করে তাকায় মায়ার দিকে।

—কি হয়েছে তোমার?

মায়া কোন কথা বলতে পারে না। মুখটা নীচু করে।

সুব্রত নাগ স্পষ্ট দেখতে পায়। মায়ার চোখ দিয়ে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল ঘাসের ওপরে।

মায়া চোখ তোলে না। চোখ নীচু করেই উঠে পড়ে। পিছন ফিরে হাতের তালুতে চোখ দুটো মুছেই হাঁটতে শুরু করে।

সুব্রত নাগ ওঠে না। ওখানেই চুপ করে বসে। বসে বসে ভেবে কী যে হল কোন কুল কিনারাই বার করতে পারে না। মায়ার চোখের জলের মানেটা কোন মতেই ওর কাছে পরিষ্কার হয় না।

মায়া ওখান থেকে সোজা বাড়ি চলে আসে। নিজের ঘরে এসে মেজেতেই বসে গা এলিয়ে। চেয়ারে উঠে বসতেও আর ইচ্ছে হয় না। শরীরটা ওর অবশ অবশ লাগছে। কিছুই ভাল লাগছে না। কিছু না।

এমন কি আলোটা পর্যন্ত জ্বালতে ভাল লাগছে না।

অন্ধকার ঘরে একা একা বসে সুব্রতর কঠিন হাতের স্পর্শটা যতই মনে করবার চেষ্টা করে ততই আজ ওর চোখ দিয়ে জল গড়ায়।

ও কিছুতেই আজ আর চোখের জল বন্ধ করতে পারে না।

রাত বাড়ছে। মায়া একা একা তেমনি চুপ করে বসে আছে।

কাজল বসুমল্লিক এতক্ষণে ঘরে ঢোকেন। সুইচটা টেপেন। আলো জ্বলে।

মায়াকে মেঝেতে ও-ভাবে বসে থাকতে দেখে ওঁর একটু কেমন কেমন লাগে। তবু শান্ত স্বরেই বলেন, কখন এলে ?

মায়া তাকায় মায়ের দিকে। কথা বলে না। অসহ্য লাগে ওর আজ। অসহ্য লাগে মায়ের উপস্থিতিটা।

কাজল ওর চেহারা দেখে বিস্মিত হন। চিন্তিত হন। মুখখানা এত শুকনো কেন ? অন্ধকার ঘরে বসে কেন ? কি করছিল ও একা একা বসে ?

সন্দেহ ঘনিয়ে আসে কাজলের চোখে।

শুধু বলেন, তোমার কি অসুখ করেছে ?

মায়া আবার চোখ তোলে ঃ না।

—তবে চেহারা এমন হয়েছে কেন ?

—কি করে জানব ?—একটু রুক্ষ স্বরেই বলে ফেলে মায়া

বলেই ভয়ে ভয়ে মায়ের দিকে তাকায়। আতঙ্কে বুক কাঁপে।

কাজল বসুমল্লিক একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকেন। কি একটু ভাবেন। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলেন, আমি তোমাকে খুঁজছিলাম। পার্টির কয়েকখানা চিঠি আমার নিজের আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। আমি বলে যাব, আর তুমি লিখবে। এসো এঘরে এসো।

মায়ার সমস্ত স্নায়ুগুলো বিদ্রোহ করে ওঠে। হাত পায়ের বশ নেই। শরীরটায় ঝিম ধরেছে, এর ওপর মায়ের কাছে বসে চিঠি লেখা!

ভাবতেই ওর মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। কানদুটো রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে।

বলে ফেলে, আমি এখন পারব না।

কাজল বসুমল্লিক স্তম্ভিত হয়ে তাকান। তারপর অতি কঠোর স্বরে বলেন, আমি বলছি পারবে।

মায়া একবার কেঁপে ওঠে। সর্বাঙ্গ ওর ঘামতে থাকে।

ও একথা মর্মে মর্মে জানে যে এ আদেশ অমান্য করা মানে ভীষণ একটা কিছু মায়ের কাছ থেকে আশা করা।

মুখটা নিচু করে ধীরে ধীরে ওঠে।

যন্ত্রচালিতের মত মায়ের পেছন পেছন ঘর থেকে বেরোয়।

দিন কয়েক কাটে, মায়া অনেক অবসন্ন হয়ে পড়েছে এই কয়েক দিনে। আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে তার কারণ সুব্রত কয়েকদিন ধরে পার্টি আপিসেও আসে না। রাস্তায়ও দেখা হয় না। মায়া ভেবে ঠিক করতে পারে না, কী হল ওর। দিন আষ্টেক কেটে গেল,

তবু সুব্রতর দেখা নেই। ভাবতে ওর ভয় করে। সুব্রত কি তার ওপর রাগ করল কোন কারণে?

রাগ কেন করবে? ও তো এমন কিছুই বলে নি, যার জন্যে সুব্রত রাগ করতে পারে?

সমীরের পড়ানো ওর মাথায় কিছুই ঢোকে না। বার বার এদিক ওদিক তাকায়। সুব্রতর প্রতীক্ষায় সমস্ত সময়টা কাটে, তারপর ক্লান্ত পায়ে রাস্তাটুকু পেরিয়ে এসে ট্রামে ওঠে। ট্রাম থেকে নেমে বাড়ি আসে। মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে সর্বদাই আতঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়। তারপর মায়ের পাশেই শুয়ে পড়ে। ঘুম ঠিক হয় না। নিদারুণ ক্লান্তিতে চোখদুটো বুজে পড়ে থাকে শুধু।

দশদিন কেটে গেল। সেদিনও মায়া যথারীতি ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেই ট্রাম থেকেই নামল সুব্রত। তার ফেরবার সময়ে।

মায়ার সর্বাঙ্গ সতেজ হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে।

সুব্রত এসে সামনে দাঁড়াল।

মায়া কি বলবে কিছুই ভেবে পেল না। তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

সুব্রতই বললে, চলো।

নীরবে ওর পাশাপাশি চলল মায়া।

সুব্রতই বললে, আর বল কেন, দুচারদিনের জন্যে বাইরে যেতে হয়েছিল, পার্টির কাজেই।

মায়া কথা বলে না।

—মানে তোমার মায়ের হুকুমে।

মায়া মায়ের নামে চমকে ওঠে।

সুব্রত গম্ভীর মুখে বলে, রাজনীতি করতে এসে দেখছি, কতকগুলো খেয়ালী মানুষের কাছে জীবন বিকিয়ে দেয়া। এমন ধারণা আমার ছিল না। জানি পার্টিতে 'ডিসিপ্লিন' দরকার, কিন্তু তার চেয়েও বোধহয় বেশি দরকার প্রত্যেককে কিছু ভাবতে দেবার অধিকার।

একটু থেমে একটু হেসে বলে, কিন্তু মজা এই যে দলগত রাজনীতিতে তা হবার জো নেই। দল-টল গুলো বড়ই বাজে জিনিস বলে মনে হচ্ছে। এ যেন অনেকটা 'কোরাস' গানের মত। মূল গায়েন যারা তারা মূল গায়েনই থাকবে, বাদবাকী সব যন্ত্রের মত। হারমোনিয়ম বেহালার মত। ওদের যেন প্রাণ নেই, ওরা যেন ভাবতেই জানে না।

মায়া চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। একটা কথাও বলে নি এতক্ষণ।

—চলো, ওই মাঠটাতেই বসি। তোমার সঙ্গে দু-চারটে কথা আছে।

মায়া নীরবে ওর পেছন পেছন গিয়ে মাঠে বসে।

সুব্রত ওর সামনে বসে।

—আচ্ছা তুমি সেদিন কাঁদলে কেন বল তো? বলতে বাধা আছে?

মায়া চুপ করে বসে থাকে।

—কথা বলছ না কেন? বলতে চাও না? থাক তবে।

মায়া তো বলতেই চায়। সব বলতে চায়। সমস্ত কথা বলতে চায়। কিন্তু বলবে কি করে? আবেগে ওর গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। চোখ দুটো আবার যে জলে ভরে আসছে।

সুব্রত চুপ করে বসে থাকে।

মায়া ওর দিকে হঠাৎ একবার তাকায়। ডাগর চোখদুটোয় ওর জল টলমল করছে।

সুব্রত অবাক হয় আর একবার।

তবু সহজ গলায় প্রশ্ন করে, আচ্ছা, তুমি কি আমায় ভালবেসে ফেলেছ?

মায়া নীরবে ওর কাঁপা হাতখানা দিয়ে সুব্রতর হাতখানা চেপে ধরে।

—বড় গোলমালে ফেললে মায়া, এমন জানলে গোড়া থেকেই তোমার সঙ্গে সাবধানে কথা বলতাম। আমার স্বভাবটার উলটো মানে করেছ তুমি, চিরদিনই আমি এই রকম।

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের মত সহজে গা ঢেলে দিয়ে মিশতে পারি। মেয়েদের আমার অনেক সময় মেয়ে বলেই মনে হয় না। সত্যি বলছি। আমার মনে হয়, আমার এই সহজ আলাপের মানেটা তোমার কাছে অন্যরকম হয়ে গেছে।

মায়া খুব আস্তে আস্তে বলে, না, তা নয়।

— তবে ?

—কী করে বলব ?

—বল। কী বলবার আছে বল না? এই রকম একটা কিছু আমি আশঙ্কা করছিলাম।

—বলবার তো কিছুই নেই।

—কিন্তু— !

—কিন্তু নয়। যা একবার দিয়ে ফেলেছি, তা আর ফেরানো যাবে না।

সুব্রত বলে, কিন্তু আছে। আমার দিকটা ভেবেছ ?

—আপনিই বলুন।

—আমি বোধহয় তোমাকে ভাল-টাল বাসি নি। সঠিক বুঝতে হলে একটু ভাবতে হবে। কি জান, আমি তোমার সম্বন্ধে বিশেষ করে কখনও ভাবি নি।

মায়া অসহায় ডাগর চোখদুটো মেলে তাকায়। একটু বোধহয় আহত হয়।

সুব্রত বলে, তবু কি জান ? তোমার জন্যে কেমন একটু কষ্ট হচ্ছে, একথা অস্বীকার করলে মিথ্যে বলা হবে। আমার মনে হয় তোমার মনে কতকগুলো কথা চাপা আছে যা তুমি কাউকে বলতে পার না।

মায়া তাকায় ওর দিকে।

সুব্রত যে ওকে একান্ত করে ভালবাসে নি একথা ও জানে। ও আরও জানে যে কোন মেয়েকে অকস্মাৎ প্রাণ ঢেলে ভালবাসবার মত জাতের ছেলে সুব্রত নাগ নয়। ও অন্য ধাতুতে গড়া।

সহজ প্রাণখোলা দক্ষিণ বাতাস ঘরে ঢুকে সব কিছু ওলটপালট করে দিয়ে আবার বেরিয়ে যেতে জানে। বদ্ধ বাতাস সুব্রত নয়।

আর মায়া নিজে ?

মায়ার মন সুতীব্র বেগে সুব্রতর দিকে এগিয়ে চলেছে। একে রোধ করতে ও আর হয়তো কখনই পারবে না। তাই ওকে সব কথাই জানাতে হবে। মায়ের কথা সব বলতে হবে, কিছুই গোপন করা চলবে না। মায়ের দৈনন্দিন ব্যবহারের সব ও খুলে বলে সুব্রতকে।

শুনে সুব্রতর ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে। এই বোধহয় প্রথম সুব্রতর ভ্রূ কোঁচকান দেখল মায়া।

—বড়ই অদ্ভুত লাগছে মায়া! তোমার মাকে জানবার লোভ হচ্ছে। মানে ভাল করে জানবার।

মায়া বলে, জানবার উপায় তো কিছুই পাই নি।

—আচ্ছা, তোমার বাবা কোথায় থাকেন ?

—ঠিক জানি নে।

—মাকে জিজ্ঞেস কর নি ?

—করেছিলাম। জিজ্ঞেস করলে বলে, ও কথা থাক।

—কেন ?

—কি করে জানব। আমি আজও জানি না, আমার বাবা কোথায়।

—অথচ তোমার মায়ের সিঁথিতে সিঁদুর তো দেখেছি।

—হ্যাঁ, সিঁদুর পরেন। বাবা নিশ্চয় বেঁচে আছেন।

—কোথায় আছেন, কোনমতে জানতে পার না ?

মায়া ম্লান মুখে বলে, জানবার কোন উপায়ই দেখি না।

—বাবাকে তোমার মনে আছে ?

—না।

সুব্রত হঠাৎ বলে ফেলে, হয়তো তোমার মা বিবাহিতা নন, এমনও তো হতে পারে ?

মায়া মুহূর্তে কেঁপে ওঠে, কী বলছেন আপনি ?

সুব্রত লজ্জিত হয়, না। এটা আন্দাজ মাত্র।

মায়ার হাতখানা এবার সুব্রত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়।

—তোমার কী মনে হয় ?

—আমার মন বলে, আমার বাবা আছেন। আর তিনিও বোধহয় আমারই মত দিনের পর দিন মায়ের অদ্ভুত ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে কোথাও চলে গেছেন।

—ঠিক বলেছ। এই রকম একটা কিছু নিশ্চয়ই হতে পারে।

—আমার আরও মনে হয়, আজ আমার বাবা থাকলে আমি বাবার দিকেই যেতাম। আর মা হয়তো এতটা জুলুম আমার ওপর করতে পারত না।

সুব্রত চিন্তিত মনেই বলে, এ কথাটাও বোধহয় ঠিক।

মায়া চুপ করে থাকে। সুব্রতও কী যেন ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে যায়।

রাত অনেকটা হয়ে গেছে। পার্কটা সম্পূর্ণ নির্জন হয়ে আসছে ক্রমে। আকাশটা মেঘলা করেছে। একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না।

গুমট গরম পড়েছে। পার্কের গাছের একটা পাতাও নড়ছে না।

মায়া বলল, অনেক রাত হল কিন্তু।

সুব্রত তাকায়, হুঁ। চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

—আজ আর হাঁটতে পারব না।

—না, ট্রামে চল।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এসে ট্রামে ওঠে।

আর একটা কথাও ওরা বলে না।

ট্রাম থেকে দুজনেই নামে।

চলতে চলতে হঠাৎ সুব্রত মায়ার হাতের অনেকখানি নিজের হাতটা দিয়ে কাছে টেনে নেয়।

মায়ার ভাল লাগে। ও একটুও সরে আসে না।

একটুখানি এগিয়ে সুব্রত মায়াকে নিজের আরও কেছে টেনে নিয়ে ডান পাশে ফিরে বলে ওঠে, এই যে মাসিমা।

মায়ার বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে। সুব্রতর হাতের মুঠোয় হাতটা কেঁপে ওঠে।

—খুকি!

সুব্রত আরও জোরে ওর হাতটা চেপে ধরে চোখদুটো পুরোপুরি মেলে তাকায়।

কাজল বসুমল্লিকের চোখে আগুন ঝরে।

সুব্রত হাসে ঃ রাত হয়েছে। তাই পৌঁছে দিয়ে গেলাম।

কাজল বসুমল্লিক স্তম্ভিত হয়ে যান ছেলেটির স্পর্ধা দেখে।

সুব্রত এইবার মায়ার হাতটা ছেড়ে দেয়।

কাজলের দিকে একবার তাকিয়ে হাসে ঃ চললুম মাসিমা।

সুব্রতর হাসির আগুন কাজল বসুমল্লিকের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি যেন জ্বলতে থাকেন।

সুব্রত নাগ লম্বা বলিষ্ঠ দেহটা নিয়ে পেছন ফেরে। চলে যায়।

বিশাল একটা ফারনেসের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে মানুষের যেমন অবস্থা হয়, মায়া তেমনি অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে মায়ের অগ্নিদৃষ্টির সামনে।

পায়ের জুতোটা কেন খুলতে পারলেন না কাজল বসুমল্লিক? কেন মারতে পারলেন না সুব্রতর দুই গালে? বিরক্তিতে, রাগে, অপমানে নিষ্পেষিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কাজল। গুমট গরমে দরদর করে ঘাম পড়ে কপালের খুচরো চুল বেয়ে টপটপ করে।

মায়ার দিকে তাকান।

মায়া এখনও সটান দাঁড়িয়ে আছে। ধুলোয় মিশে যায় নি।

ধীরে ধীরে কাজলের মুখখানা রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে যায়। মায়ার দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত স্বরে বলেন, তোমার জন্যে অনেকক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

মায়ের গলায় এমন নিস্তেজ ক্লান্ত স্বর শুনে অবাক হয়ে তাকায় মায়া। মায়ের এমন বিবর্ণ মুখ কখনও দেখে নি। কোন কথা না বলে ও মায়ের পেছন পেছন বাড়িতে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে যায়।

আজও রাত্রে কাজল বসুমল্লিক ঘুমোতে পারছেন না। মায়া ঘুমোচ্ছে তাঁর পাশে শুয়ে। মায়া কি ঘুমোতে পাচ্ছে ? কে জানে ? হয়তো চোখ বুজে জেগে আছে। আজকের ঘটনা এতই বিসদৃশ আর আকস্মিক যে ওঁদের দুজনের মনেই ঝড় তুলে দিয়ে গেছে সুব্রত নাগ।

আজ আর মায়ার ওপর রাগ করতে পারছেন না। আজকে রাগ করাটা যে কত বড় মূর্খামী হত সেটা কাজল বসুমল্লিক জানেন। আরও জানেন যে আজ রাগ করলে মায়াও হয়তো আর চুপ করে থাকত না। সুব্রত আজ মায়ার মনোভাবটা এত স্পষ্ট করে দিয়ে গেছে যে রাগ করলেও সে মনোভাব মায়া চাপত না। কারণ আর চেপে যাওয়ার কোন মানে হয় না, তাই স্বীকার করলে গলার জোর নিয়েই সব স্বীকার করত।

কাজল বসুমল্লিক আজ অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তবু বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলেন না। আস্তে আস্তে উঠে অন্ধকার ঘরের জানালার ধারে গিয়ে বসলেন।

এত ক্লান্তি কেন ?

সুব্রত আজ তাঁকে যেভাবে অগ্রাহ্য করে মায়ার হাত চেপে ধরে তাঁর কাছে এল, তাতে রাগ যে তাঁর হয়েছিল, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সেই রাগের বেগটা স্নায়ুর সব শক্তি দিয়ে চাপতে গিয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তবু রাগ তাঁকে চাপতেই হল। কেননা

রাগ করে কোন লাভ হত না। উলটে লোকসানটা পুরোপুরিই হত।

সুব্রত মায়াকে জোর করে যে নিজের কাছে আকর্ষণ করে রেখেছিল, সেটা তাঁর চোখ এড়ায় নি। তিনি রাগ করলে সে আকর্ষণ অনেক বেশী বেড়ে যেত। এটা তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন। তাই নিদারুণ ক্রোধ চাপতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়লেন।

এমনি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন আরও একদিন রাত্রে। গভীর রাত্রে।

রমাপ্রসাদ চলে গেল পরদিন ভোরে। আগের দিন গভীর রাত্রে রমাপ্রসাদের উপর রাগ করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন কাজল। রাগ চেপে তাকে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রমাপ্রসাদকে রাখতে পারলেন না। চলে গেল। অজয় চলে গেল। রমাপ্রসাদ চলে গেল। রইল শুধু মায়া।

রমাপ্রসাদ যখন চলে যায় মায়া তখন মাস তিনেকের কোলে।

কাজল ভেবেছিলেন মায়ার জন্যে রমাপ্রসাদ নিশ্চয় বাঁধা পড়বে, কিন্তু মায়ার জন্যেই আরও যেন বিশেষ করে গেল রমাপ্রসাদ। আশ্চর্য মানুষ! রমাপ্রসাদের মত পুরুষ আজ পর্যন্ত আর একটাও ওঁর চোখে পড়ল না।

অতি শান্ত নম্র একটি মানুষ কোথা থেকে এত জোর পেল, এ বিস্ময় আজও কাজলের কাছে বিস্ময়ই রয়ে গেছে। আজও রমা-প্রসাদের নাগাল পান নি কাজল। ভাল করে বুঝে উঠতেই পারেন না মানুষটার চরিত্র।

অজয় চলে যাবার বছর দুয়েকের ভেতরই বিয়ে হয়েছিল ওর রমাপ্রসাদের সঙ্গে। ওর দাদা, অজয়ের সঙ্গে ওর সম্বন্ধটা অবৈধ বলে ধরে নিয়ে, একটা বৈধ সম্বন্ধ পাতিয়ে দেবার জন্যে ছেলের খোঁজে উঠে পড়ে লেগেছিল। মা-ও আভাষ পেয়ে তাকে উৎসাহ দিয়েছিল। বাবার কাছেও চিঠি গেল।

বাবা এলেন। সব শুনে বললেন, ওর বিয়ে দিয়ে দাও।

মা বললেন, যদি ও গোলমাল করে ?

ওর দাদারও সেইটেই ভয়।

বাবা কিন্তু অতি রাশভারী মানুষ। মুখটা লাল করে বললেন, ছেলে ঠিক করে আমায় জানিও। আমি এসে বিয়ে দিয়ে যাব। কাজল আমার মেয়ে, এটা ভুলে যাচ্ছ কেন ?

ওর দাদা আর মা আশ্বস্ত হল।

কাজল তখন কলেজে পড়ে। ব্যাপারটার আঁচও পেয়েছিল কিন্তু কিছুই বলে নি।

কাজল জানত যে বিয়েতে অমত ও করবে না। মদনলালকে দিয়ে অজয়কে আঘাতের পর আঘাত করে কাজল তখন নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

মদনলালদের বাড়ি থেকে উঠে এসে মদনলালের সঙ্গেও কথা বলা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে।

এখন বিয়ে করতে আপত্তি ওর নেই। আপত্তির কারণ যা ছিল সবই চুকে গেছে। এখন বিয়ে করে, একটি পুরুষের সঙ্গে একান্ত করে একটি ঘর পাতা। মন্দ কি !

এই সময়ই রমাপ্রসাদের খোঁজ মিলল।

শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কাজল শুনেছিল, বিয়ে করবার ইচ্ছে রমা-প্রসাদের ছিল না।

রমাপ্রসাদের বাপ মা নেই। বড় ভাই, তাঁর স্ত্রী আর তাঁরই দুটি ছেলে।

এইটুকুই সংসার কিন্তু বিত্ত অগাধ।

কলকাতার বহুদিনের বাসিন্দা। শহরতলী থেকে কিছু দূরে প্রচুর জমিজমা। নগদ টাকাও কিছু কম নয়। তবু রমাপ্রসাদ বিয়ে করতে চায় নি।

মরবার আগে পর্যন্ত রমাপ্রসাদের মা বারবার বলে গেলেন, বিয়ে করে সংসার তোকে করতেই হবে বাবা।

চুপ করে ছিল রমাপ্রসাদ।

মা যখন আবার বলতে গেলেন, মায়ের মুখটা চেপে ধরল।

ছলছল চোখে বলল, আর কিছু বল না মা, তোমার পায়ে ধরি।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মা আর বলতে পারেন নি কিছু।

কিছুদিন আগে দাদা যখন বললেন, মায়ের খুবই ইচ্ছে ছিল, বিয়ে কি তুই করবি?

রমাপ্রসাদ চুপ করে ছিল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, যা তোমার ইচ্ছে করো।

এরপরই কাজলের খোঁজ পেয়ে ওকে দেখতে এল রমাপ্রসাদের দাদা আর তাঁর স্ত্রী। কাজল কলেজে পড়ে। পূর্ণ যৌবনা রূপবতী। আজকের দুনিয়ার সঙ্গে মানিয়ে চলবার মত মেয়ে। ভারী পছন্দ হল ওর দাদার। তবু যদি রমাপ্রসাদের ভেতর কিছু পরিবর্তন আনতে পারে এই মেয়ে। রমাপ্রসাদের নির্লিপ্ত নিরাসক্তিকে লোভের লালায় আর কামনার জালে আটকাতে পারে এই মেয়ে। ওর দাদা খুব খুশীই হল।

বললে স্পষ্ট, আমার ভাই একটু সেকেলে, তোমাকে মানিয়ে নিতে হবে কিন্তু।

কাজল কথা বলে নি। সেকেলেকে একেলে করা কী আর এমন একটা কাজ! এমন লোভনীয় যৌবন নিয়ে একটা পুরুষকে নিজের মত করে গড়ে নেওয়া কী আর এমন একটা কাজ!

বিয়ে তাই ঠিক হয়ে গেল।

বিয়ের দিন সকাল পর্যন্ত রমাপ্রসাদের চিন্তাই করেছে কাজল। কী করে মানুষটাকে নিজের সঙ্গে মানিয়ে নেবে, সেই চিন্তা। ভাসুরটিকে বেশ ভালই লাগল। খাটো পরিষ্কার মানুষটি। মাজাঘষা ভাবখানা। সিগারেটটা বড্ড বেশী খান। আর কথার ভেতর ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন মাঝে মাঝে। বেশ বাবু-মানুষ। স্ত্রীটিও বেশ মার্জিত। চাপা নাক আর চোখদুটো ছোট হলেও বেশ সপ্রতিভ ভাব বজায় রেখে চলেন সব সময়। কথায় কথায় হাসেন। একটু বেশী হাসেন।

তা হোক। ওদের দুজনকেও ভাল লেগেছে কাজলের। আসল মানুষটি কিন্তু একবার দেখতেও এল না। দেখাও দিল না।

সে নাকি বলেছে, দাদা দেখেছে, ওতেই হবে। আমার দেখবার কী দরকার।

তার দরকার না থাকতে পারে, কাজলের দেখবার একটু দরকার ছিল।

কথাটা অবশ্য খুলে আর কাউকে বলল না কাজল। চেপে গেল। খুশি-খুশি মনে সব মেনে নিল।

কিন্তু সব ওলটপালট হয়ে গেল বিয়ের দিন দুপুরে। মদনলাল এল, অজয়ের সব কথা বলে গেল। কাজলের ভেতরের সাজানো ভাবগুলো সব যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

আজ মনে হয় কাজলের, মদনলাল যদি সেদিন না আসত তবে বোধহয় জীবনের গতি তার সম্পূর্ণ অন্য দিকেই যেত। কিন্তু মদনলালকে আসতে হবে। নইলে তার জীবনে এতবড় নিষ্ঠুর পরিহাস পূর্ণ হবে কি করে?

কাজল যা ভেবেছিল, সব ভাবনার সমাধি হয়ে গেল। এক গভীর গহ্বরে তাকে ফেলে দিয়ে জীবনের মত চলে গেল মদনলাল। যদি সম্ভব হত এ বিয়ে করত না কাজল।

একবার ভাবল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখুনি পালিয়ে যাবে নাকি অজয়ের কাছে?

কিন্তু ভাবতেই একখানা মুখ ওর মাঝে ভেসে উঠল, সেটি ওর বাবার মুখ।

না। আর তা হয় না। যা মেনে নিয়েছে, তা জীবনের মতই মেনে নিতে হবে। এই মুহূর্তে আর কোন পরিবর্তন হতে পারে না।

স্তব্ধ ম্লান মুখে বিয়ের আসরে আসতে হল কাজলকে। বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সময় ভাল করে তাকালও না রমাপ্রসাদের দিকে। সবটুকু রাগ যেন গিয়ে পড়ল রমাপ্রসাদের উপর।

কেন এ লোকটা তাকে বিয়ে করতে এসেছে? কী পাবে তার কাছ থেকে?

এই দেহটা? দেহটা পাবার জন্যে যে লোভী তাকে নিতে এসেছে, তাকে ঘৃণা করা যায় ভালবাসা যায় না। কাজল ফিরেও তাকাল না রমাপ্রসাদের দিকে।

সবচেয়ে ওর কষ্ট হচ্ছিল যে, অজয়ের জন্যে ও আর কিছুই করতে পারল না। তার অপরাধের বোঝা তাকেই সমস্ত জীবন বয়ে বেড়াতে হবে। এই আক্ষেপটা তীব্র হয়ে উঠল ওর মনে।

এই আক্ষেপটা ওর যতই বাড়তে লাগল, ততই রাগটা পড়তে লাগল রমাপ্রসাদের ওপর।

বাসরঘরে বসে একবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকাল রমাপ্রসাদের দিকে। দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর।

রমাপ্রসাদের গায়ের রঙ শ্যামল। বেশ লম্বা কিন্তু নরম দেহ। উন্নত নাকের পাশে চোখদুটি টানা টানা। ভেজা ভেজা ঠাণ্ডা চোখ। গলায় তুলসীর কণ্ঠি। প্রশান্তি ঘনীভূত হয়ে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে যেন। দেহের প্রতিটি ভঙ্গীতে নিরীহ শান্ত আবেশ।

এ যেন ভিজে তুলো একরাশ।

অজয়ের সঙ্গে তুলনা করলে মানুষটাকে তো পুরুষ বলেই মনে হয় না।

খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলে লম্বা টিকিটি পরিষ্কার চোখে পড়ে।

কণ্টকিত হয়ে ওঠে কাজলের শরীর।

—কিগো বর পছন্দ হল?—বলল অল্পবয়সী বউ একটি।

কাজল সটান মাথা নাড়লে, না।

ওর গম্ভীর ম্লান মুখে মাথা নাড়া দেখে সবাই প্রথমটা থমকে গেল; কিন্তু পরমুহূর্তেই কলকলিয়ে হেসে উঠল সবাই।

—বুঝলি না, স্বীকার করবে না।

—তা নয়। আসলে খিদে পেটে ঠিকই আছে। বলে মুখ নষ্ট করে আর কী লাভ?

কোন জবাব দিল না কাজল। তেমনি চুপ করে বসে রইল।

যারা বাসর জাগতে এসেছিল, তাদের কোলাহলে হাসির জোয়ারে ওর গাম্ভীর্য কিছুতেই ভেসে গেল না। অগত্যা গান শুরু করলে কয়েকটি মেয়ে।

কিছুক্ষণ পরেই চেপে ধরল ওরা রমাপ্রসাদকে।

—আপনাকে একটা গান গাইতেই হবে।

রমাপ্রসাদ ভাসাভাসা চোখদুটো তুলে হাসল একটু।

—হাসলে চলবে না।

—কিন্তু—।

—কিন্তু-টিন্তু শুনব না।

রমাপ্রসাদ শান্ত স্বরে বললে, নাম কীর্তন ছাড়া আর কোন গান তো আমি জানি না।

মেয়েদের ভেতর হাসির রোল পড়ে গেল।

—বলে কী ভাই, বাসরে নাম কীর্তন!

—বেশ কীর্তনই হোক।

—তা নয়, ও সব বাজে কথা, মিথ্যে কথা।

কাজল কাঠের মত নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল শুধু।

পুরুষ মানুষের গলার স্বর এমন মিহি সুরেলা হয় আগে জানত না কাজল। এ কি পুরুষ মানুষ!

—মিছে কথা বললে ছাড়ব না আমরা।

রমাপ্রসাদ একটু হেসে বললে, মিছে কথা আমি বলি না।

আবার হাসির তরঙ্গ।

—ওঃ! সত্যিবাদী যুধিষ্ঠির!

—ওসব চালাকি ওনার! ধর না চেপে।

—বেশ তবে কাজলকে গাইতে বলুন!

রমাপ্রসাদ আর কোন কথা বলল না। কাজল একেবারে নীরব।

মেয়েরাও আর বেশী কথা বলল না! নিজেরাই কিছুক্ষণ গান গেয়ে হেসে গল্প করে একে একে বেরিয়ে গেল গভীর রাত্রে।

শেষের বউটি যাবার আগে মুখ টিপে হেসে বললে, আমরা আর বিরক্ত করব না। নিন শুয়ে পড়ুন। আমরা রয়েছি বলেই তো এত রাগ। নাও ভাই কাজল, এবার রইল তোমার বর। আমরা জ্বালাব না। ভয় নেই।

চলে গেল ওরা। যাবার আগে দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল।

যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল রমাপ্রসাদ। চুপ করে শান্ত হয়ে।

কাজল একটু নড়ে চড়ে বসল। তারপর দেয়ালে মাথাটা ঠেস দিয়ে কাত হল। সমস্ত দিনের উত্তেজনা আর কোলাহলের পর একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

ভাবতে আর ভাল লাগছে না। একথা তো নিশ্চিত যে এ লোকটার সঙ্গে তার কখনই বনবে না। কখনই ভালবাসতে পারবে না একে। এক রকম স্থির করেই ফেলেছে ও। তাই ভাববার আর কী আছে ?

রমাপ্রসাদ তাকায় শান্তভাবে, দেখে ও দেয়ালে ঠেস দিয়ে কাত হয়েছে।

আস্তে আস্তে কাজলের পাশে ও দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে।

কাজল চোখ বোজে। রমাপ্রসাদ একবার ভাবে বলবে নাকি, শুয়ে পড়লেই হয়। কিন্তু কিছুই বলে না।

কাজল ভাবে বলবে নাকি, ঘুম পাচ্ছে।

থাক। দরকার নেই।

অগত্যা ওইভাবে বসে বসেই রাত কাটে।

পরদিন শ্বশুরবাড়ি আসবার সময় ও মায়ের সঙ্গে দাদার সঙ্গে ভাল করে কথাও বলে না। কি জানি কেন ওদের সকলের ওপরই

ওর তীব্র অভিমান হয়। এমন সাত-তাড়াতাড়ি বিয়েটা কি না দিলেই হত না ? সম্পর্ক ও চুকিয়ে দেবে এদের সঙ্গে।

এতই যদি তাকে তাড়িয়ে দেবার সাধ এদের ও চলেই যাবে জন্মের মত। বাপের বাড়ি আর পারত পক্ষে আসবে না। দাদা একটু ক্ষুণ্ণ হয়। মা হাসে। ও রাগ দুদিন পরেই পড়ে যাবে।

শ্বশুর বাড়ি এসে ও যাদের সঙ্গে সত্যি সত্যি অন্তরের সঙ্গে মিশল সে ওর ভাসুর আর জা। ওঁদের বেশ ভাল লাগল কাজলের। যা কিছু কথা ওদের সঙ্গেই বলল।

কথায় কথায় হাসতে হাসতে বললে জা, তোমার সঙ্গে বাজী ধরতে পারি ভাই, একটা কাজ যদি করতে পার। বল পারবে ?

কাজল জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

—পারবে কি না বল ?

—কী ? আস্তে আস্তে বলে কাজল।

—আমার দেওরটিকে রাগাতে পার ?

কাজল একটু অবাক।

—না, ঠাট্টা নয়। সত্যি, আমি ভাই এ বাড়িতে এসে অব্দি একদিনও ওকে রাগাতে পারি নি। এইটেই আমার বড় আপসোস। আর তোমার ভাসুর ? উনি রেগেই আছেন। পানের থেকে চুন খসলেই রাগ।

কাজল খুবই অবাক হয় ! বলে কি, লোকটা রাগতে জানে না !

—এইটে আমার আপসোস। পুরুষ মানুষকে চটিয়ে দিতে না পারলে মেয়েদের কেমন লাগে বলতো ? প্রথম থেকেই তাই বলি তোমায়। রাগাতে হবে ওকে। তবে তো মজা হবে। জমবে।

কাজল কোন কথা বলে না। জা-টিকে ওর বেশ লাগে।

ফুল শয্যার রাতে কাজলকে ঘরে ঢুকিয়ে যখন বড় জা বেরিয়ে যায় হাসতে হাসতে রাত তখন একটা বেজে গেছে।

বাইরে মেয়েদের কলরব তখনও ক্ষীণ হয় নি।

কাজল মেঝের ওপর দাঁড়িয়েই দেখে রমাপ্রসাদ বসে আছে খাটের এক কোণে।

গায়ে কোন জামা নেই। কণ্ঠে আর বুকে সাদা দাগ কি একটা দেখতে পায়। একটু ভাল করে চেয়ে দেখে উন্নত নাকে শ্বেত চন্দনের তিলক। কণ্ঠে বুকেও তাই।

কাজলের ভ্রূ ছুটো কুঁচকে ওঠে। এ যে একেবারে ভূত!

ধীরে ধীরে এসে খাটের ওপাশটায় শুয়ে পড়ে। কয়েক ঘণ্টা রাত এমনি করে কেটে গেলেই যথেষ্ট। খাটটা নড়ে ওঠে।

চোখটা আধবোজা করে তাকায় কাজল।

রমাপ্রসাদ উঠল। দোরটা খিল দিয়ে এল।

আবার এসে সেইখানেই আস্তে আস্তে বসল। একবার তাকাল কাজলের দিকে। আবার তাকাল দরজার দিকে। তারপর পা ছুটি উঠিয়ে ভাঁল করে বসল খাটের ওপর।

হাত জোড় করে চোখ বুজে বসল একটু সময়।

কাজল তো অবাক। তখন আধবোজা চোখে দেখছে কাজল।

একটু পরে একটা বড় নিশ্বাস পড়ল রমাপ্রসাদের। তাকাল ও কাজলের দিকে।

খুব আস্তে আস্তে বললে, ছাখো, একটা কথা বলি তোমায়।

কাজল নীরব।

—ঘুমোলে ?

কাজল সাড়া না দিয়ে পারল না। চোখ মেলে তাকাল।

রমাপ্রসাদ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে একটু মৃত্থ হেসে বললে, বিয়ে করবার ইচ্ছে ঠিক আমার ছিল না।

—আমারও না।—ফস্ করে রেগে বলে বসল কাজল। এ-ই স্বামীর সঙ্গে কাজলের প্রথম কথা।

উত্তরে রমাপ্রসাদ আবার একটু হাসল। হাসিটি ঠাণ্ডা। বড় মিষ্টি। চোখ ছুটো নীচু করল একবার। তারপর বললে, তবে তো ভালই হল!

—ভাল কি খারাপ জানি নে। যা সত্যি তাই বললুম।

—বেশ করেছ। সত্যি বলাই তো ভাল। সত্যি বলতে যে প্রথমে তোমার বাধে নি, এতে আমার ভাল লাগছে।

কাজল নীরব। এর আর উত্তর কি দেবে ?

—একটা কথা ছিল। আবার বলে রমাপ্রসাদ।

কাজল নীরবে তাকায়।

—তোমার জেনে রাখা ভাল। গোড়াতেই তোমাকে বলে রাখা ভাল। আমি কিন্তু নিজের বলে কিছুই রাখি নি।

কাজল কথাটা ভাল করে বোঝে না। তাকায়।

—তোমাকে বিয়ে করে ভুল করলাম কিনা জানি নে।

কাজল মুখটা নীচু করে পরিষ্কার বলে, আমিও সেই কথাটাই ভাবছি।

—কেন ?

—কারণ আছে নিশ্চয়ই। সেটা ধীরে ধীরে জানাই ভাল।

রমাপ্রসাদ হাসে, ধীরে ধীরে জানানোটা ঠিক হবে না। যা বলবার গোড়াতে বলে কয়ে নেওয়াই ভাল।

—একেবারে বলে ফেললে আঘাতটা কঠিন হতে পারে। বলে বসল কাজল। কি করে যে ও এত কঠোর হতে পারছে, নিজেই ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। এই তো কঠোর হওয়ার শুরু।

—আঘাত !—বেশ হেসে উঠল রমাপ্রসাদ, কোথায়, মনে ?

মাথা নাড়ে কাজল।

রমাপ্রসাদ বলে, আমার মন তো আমার নয়। আঘাত লাগবে কোথায় ?

কথাটা আবার বুঝতে পারে না কাজল।

রমাপ্রসাদ বলে, আমার মনপ্রাণ তো রাধাগোবিন্দের পায়ে ঢেলে দিয়েছি বহুদিন। আমার মন তো আমার বশে নেই। প্রাণের ওপরও অধিকার বলে কিছু নেই।

একটু থেমে আবার বলে, তাই তো বলছিলাম, তোমাকে

আর কী দেব বল? তুমি আমার কাছে কী চাও। সত্যি কথাই বল।

—কিছুই না।—স্পষ্ট বলে কাজল।

—বাঁচালে আমায়। রাধারানীর কৃপায় আমার পথ ছেড়ে দিলে তুমি প্রথম দিন থেকেই।

কাজল ওর কথাবার্তার ধরনে একটু অবাকও হয়। লোকটা পাগল নাকি? কথায় কথায় গোবিন্দ আর রাধা! ব্যাপার কী?

আধঘণ্টা আগেও তো কাজল স্বামীর কাছ থেকে এমন সব উত্তর আশা করে নি! আশা যা করেছিল সেটা অতি সাধারণ। ভরন্ত যৌবন নিয়ে নিখুঁত রূপসজ্জায় সেজে ও দম্ভ নিয়ে বসে থাকবে। মানুষটা বার বার তার দিকে হয়তো হাত বাড়াতে চাইবে, আর বার বার সে প্রত্যাখ্যান করবে। তার যৌবনের সুষমা দেখে যত তৃষ্ণার্ত হবে, ততই পিপাসা বাড়াবার জন্য কাজল তার যৌবনকে আরও লোভনীয় করে স্বামীর মুখের সামনে তুলে ধরবে, মুহূর্তে সরে আসবে। এই তো আশা করেছিল।

ভেবে এখন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল কাজল যে, সে প্রত্যাশা কিছু একটা করেছিল।

কিন্তু এ মানুষটা কড়ে আঙুল দিয়ে একবার ছুঁয়েই দেখল না যে কাজলের গা কত আতপ্ত নরম।

কিছু সময়ের জন্য একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল কাজল। এমন তো কথা ছিল না। এমন একটা মানুষ থাকতে পারে সে তো কল্পনাও করতে পারে নি।

আরও রেগে গেল কাজল। ওকে দ্বিগুণ রেগে আঘাত করবার জন্যই বোধ করি বললে, আমার কথাটাও কিন্তু পুরো বলা হয় নি।

—বল।

—আমার মনপ্রাণ আমি আর একজন পুরুষকে অনেকদিন আগেই দিয়ে দিয়েছি।

—সে পুরুষ কি কোন মানুষ?

—হ্যাঁ, পুরুষ মানুষ। তার মত পুরুষ আমার জীবনে আর একটাও আমার চোখে পড়ে নি।

রমাপ্রসাদের মুখখানি একটু সময়ের জন্যে ম্লান হয়ে গেল।

—তার মানে, তুমি অন্য কোন একটি পুরুষকে ভালবাস?

—হ্যাঁ।

—সে ভালবাসায় কোন কামনা নেই?

এ ধরনের প্রশ্নের জবাব তক্ষুনি মুখে জোগায় না ওর। একটু ভাবতে হয়।

রমাপ্রসাদ বলে, মানে, তুমি তার দেহমন চাও, না, শুধু ভালবেসেই তোমার আনন্দ?

কাজল বলে ফেলে, তার দেহমন চাই বইকি!

রমাপ্রসাদ হাসে এবার, ওইখানে তোমার একটু ভুল হয়ে গেছে। ভুল আজ তোমাকে বোঝাতে পারব না। সময় এলে বুঝবে। ঠাকুরের কৃপায় তোমাকে বুঝতেই হবে।

কাজল বিরক্ত হয়, ঠাকুর-ফাকুরের কথা হচ্ছে না। বিয়ের জোরে আমার মন তুমি পাবে না। বাপ-মায়ের দেওয়া দেহটা পেতে পার।

রমাপ্রসাদ আহত হলঃ ছি ছি। এ কী বললে তুমি!

কাজল একটু চমকে উঠল।

—দেহ তো বাপ-মায়ের দেওয়া নয়। ও যে কৃষ্ণের দান! এ সবই যে তাঁর।

কাজল আরও বিরক্ত হয়, কৃষ্ণ-টিষ্ণ তো আমি জানি না। কাজেই আমি তা মনে করি না।

রমাপ্রসাদের মুখখানি ম্লান হয়ে যায়, বলে, ভগবান সম্বন্ধে শ্রদ্ধা নিয়ে কথা বলতে হয়। তা তোমার মনে করা না করায় কিছুই আসে যায় না। মনে না করলেই তো আর সত্য বদলে যায় না? এটা যে সত্য। আমরা সবাই নিত্য কৃষ্ণদাস। এই আমাদের স্বরূপ।

কাজল বলে, জানতাম না এত বাজে কথা বলা তোমার স্বভাব। তবে যা বললাম এটা মনে রাখলে বাধিত হব।

রমাপ্রসাদ বলে, মনে রাখব। নিশ্চয়ই মনে রাখব। কিন্তু এগুলো বাজে কথা নয়।

—আমার মনে হয় গোবিন্দ-টোবিন্দ সব বাজে।

রমাপ্রসাদ ম্লান মুখে বলে, আবার বলছি, ঠাকুর সম্বন্ধে অত অশ্রদ্ধা নিয়ে কথা বলতে নেই। তার চেয়ে বরং ঠাকুরের কথা না বলাও অনেক ভাল।

লোকটা সত্যি সত্যি আহত হয়েছে দেখে কাজল বেশ খুশী হয়ে ওঠে।

—শ্রদ্ধা কি জোর করে আদায় করা যায়? বলে কাজল।

—তা যায় না জানি। তাইতো ভয় হচ্ছে যে তুমি আমার স্ত্রী হয়ে যদি—।

—শ্রদ্ধা তোমার ঠাকুর আমার কাছ থেকে কোনদিনই পাবে না। বেশ তো তাকে বল না, সে জোর করে কেমন আমার শ্রদ্ধা আদায় করতে পারে?

রমাপ্রসাদের ভাসাভাসা টানা চোখ দুটো বেদনায় চিকচিক করে। বলে আস্তে আস্তে, তিনি সবই পারেন। কি জানো। আর কেউ হলে তার কথা ধরতাম না। তোমাকে যে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছি তাই তোমার জন্যে ভয় হচ্ছে আমার। রাধারানী তোমায় কৃপা করুন।

কাজল হাসে, আমার জন্যে কারুর ভয় করবার প্রয়োজন নেই। কারো কৃপা ভিক্ষা আমি করি নে।

অহঙ্কারের সুউচ্চ চূড়ায় বসে যেন কথা বলছে কাজল, রমাপ্রসাদের কাছে অন্তত তাই মনে হয়। ও ম্লান মুখে চুপ করে বসে থাকে। আর একটা কথাও বলে না।

কাজল খানিকটে তৃপ্তি নিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকে।

ভাবে, অজয়ের জন্য সে এটুকু অন্তত করবেই যে, এ লোকটাকে

কোন মতেই নিজের বলে গ্রহণ করবে না। মনটা আলাদা করে রেখে দেবে অজয়ের জন্য। স্বামীকে অবহেলা করতে সে একটুও দ্বিধা করবে না। সেটাও অজয়েরই জন্য। বিয়ের ছুপুরে যে চাপা বেদনা বয়ে নিয়ে ও এখানে এসেছে, তার কিছুটা যেন লাঘব হল আজ। অজয়ের কাছে সে অন্তত একটুখানিও আলাদা করে রাখতে পারল নিজেকে। এ দান অজয় গ্রহণ করতে না পারলেও এটা তার তৃপ্তি। অজয়ের ওপর যে অন্যায় সে করেছে, তার একটু প্রায়শ্চিত্ত। .

তবু কোথায় যেন বাধে।

অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে আবার অপরাধ করে ফেলছে না তো ?

শুধু তাই নয়, সবচেয়ে যা ওর বাধছে সেটা এই মানুষটার আশ্চর্য নির্লিপ্ততা। উত্তপ্ত ভরা যৌবন নিয়ে ফুলের বিছানায় বসেও ও যেভাবে প্রত্যাখ্যান করল রমাপ্রসাদকে, তার একটা মনোমত প্রতিবাদও শুনতে পেল না। কোথায় যেন একটুখানি আক্ষেপ থেকে যাচ্ছে।

একবার জিজ্ঞেসও করল না, কে সে মানুষ যাকে তুমি ভালবাস ? কী তার নাম ? কোথায় থাকে ? কত বয়স ? কেমন দেখতে ? কিছু না।

কতদিন আলাপ হয়েছিল ? ভালবাসা যদি তার উপরেই ছিল তবে আমায় বিয়ে করলে কেন ? আমার জীবনটা নষ্ট করবার কী অধিকার আছে তোমার ? তোমার এই আশ্চর্য যৌবনকে আমি ভোগ করবই। কোন কথা শুনতে চাই না। কথা কও। চুমু খাও। কেঁদো না।

আমি তোমার স্বামী, আমার অধিকার আমি জোর করে কেড়ে নেব। এই জড়িয়ে ধরলাম তোমায় ছুহাতে। ছাড়াও তো ? না। কিছুই বললে না রমাপ্রসাদ। ঠাণ্ডা মধুরতায় বিনম্র হয়ে রইল সর্বসময়টুকু। মানুষটার মধুরতাকে অস্বীকার করতে ইচ্ছে হয়।

ভাবতে ইচ্ছে হয় ওটা দুর্বলতা, কিন্তু ভাবতে পারছে কই ? অস্বীকার করতে তো পারছে না।

শুয়ে শুয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাজল।

ওর যৌবনের অহঙ্কারে আজ প্রথম ঘা লাগল। এই প্রথম ও দেখল যে সব পুরুষই মদনলাল নয়, অজয় নয়। অতি বিনম্র শান্ত ভাবে আগুন-জ্বালা যৌবনকে উপেক্ষা করতে পারে এমন মানুষ আছে, আর সে এই রমাপ্রসাদ। একবার তাকিয়েও দেখল না তার বুকের আঁচল কতখানি সরে গেছে। না। স্পষ্ট প্রত্যক্ষ উপেক্ষা।

একবার পাশ ফিরে শুল কাজল।

রমাপ্রসাদ অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে যেন পরম আরামে।

কাজলের বুকে আবার তীব্র অভিমানের তরঙ্গ উঠল। ঠিক আছে। সে-ও উপেক্ষা করেই যাবে। তার অত ভাববারই বা কী দরকার। নিজের মনে নিজে খাবে-দাবে বেড়াবে। আনন্দে থাকবে। কাউকেই গ্রাহ্য করবার প্রয়োজন নেই।

আর একবার পাশ ফিরল কাজল।

রমাপ্রসাদ তার পায়ের কাছে একটুখানি জায়গায় শুয়েছে এবার। চোখ দুটো বোজা। একটুও উদ্বেগ বা রাগের চিহ্ন নেই সে মুখে।

আশ্চর্য !

ভোর বেলা কখন যে উঠে গেছে রমাপ্রসাদ টের পায় নি। উঠতে একটু বেলা হয়ে গেছে কাজলের। শুয়ে শুয়ে কানে শুনতে পাচ্ছে

মৃদু সুর। বড় মধুর সুর। ঠাণ্ডা বাতাসে স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে সে সুর কানে। নাম-কীর্তন। সঙ্গে করতালের মৃদু আওয়াজ।

কাজল স্পষ্টই বুঝতে পারে এ গান তার স্বামীরই।

মন্দ লাগে না। শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে শুনতে বেশ কেমন একটা আরাম লাগে। এত মধুর সুর যে ঠাকুরের নামে হতে পারে এ কথা ও জীবনে আজ এই প্রথম জানল। কখনও তো এমন শোনে নি। গান ও ভালবাসত। অজয়ের গান ভালবাসত ও সবচেয়ে বেশী।

কিন্তু এ যেন ঠিক গানও নয়।

এ সুর বানানো নয়। এ কথা বানানো নয়। শক্তও নয়। এত সহজ বলেই কি এত মধুর!

কথাগুলো শুনতে পায়—রাধে গোবিন্দ। রাধে গোবিন্দ রাধে। এই কটা কথাই বার বার এসে লাগছে কানের ভেতর।

অলস আরামটুকু ঝেড়ে ফেলে একবার উঠে বসতে চায় কাজল। কি সব ভাবছে ও।

ভগবানের নাম করছে বুড়ো-হাবড়ার মত। তা এত ভাল লাগবার কী আছে।

কিন্তু উঠতে গিয়েও উঠতে পারে না।

নাম শেষ হয়ে যায়। সুর আর কানে আসে না। তবু ও কী এক আরামে যেন চুপ করে শুয়ে থাকে।

বড় জা এসে ঢোকে ঘরে, কি গো। ঘুম ভাঙল?

কাজল তাড়াতাড়ি উঠে বসে। লজ্জিত হয়।

—কাল বুঝি রাত্রের ঘুম একেবারেই হয় নি; তাই ভোরে এত গাঢ় ঘুম?

খিলখিল করে হেসে ওঠে।

কাজল আরও লজ্জায় পড়ে। মুখটা ওর রাঙা হয়ে ওঠে।

—কেন, ভোরে রাই জাগো রাই জাগো—বলতে বলতে তোমার উনি গঙ্গস্নান সেরে এলেন। তাও শুনতে পাও নি? আমরা তো

জ্বালায় মরি। রোজ ভোরে গঙ্গাস্নান সেরে রাই জাগো—করতে করতে ঠাকুর ঘরে ঢুকবেন আর আমাদের ঘুমের দফা শেষ।

একটু হেসে আবার বলে বড় জা, এবার ভাই এসব বাতিক ছাড়াও। ভোরে কিছুতেই উঠতে দেবে না।

জোর করে ধরে রাখলেই হল। নয়তো বেঁধে রেখো শাড়ির আঁচল দিয়ে।

আবার হেসে ওঠে বড় জা। ভারী আমুদে।

বলে, তারপর ধীরে ধীরে সকালে চায়ের নেশাটি ধরিয়ে দাও, না হয়তো একটা ডিম সেদ্ধ রুটি খাওয়াও। আমরা তবে বাঁচি। এই জন্যেই তো তোমাকে আনা ভাই।

কাজল মৃদু মৃদু হাসে। কথা বলে না।

—যাই। তোমার চা পাঠিয়ে দি।

বলে বড় জা বেরিয়ে গেল।

কাজল এবার ঘর থেকে বেরোয়। একেবারে সোজা কলঘরে চলে যায়। হাতমুখ ধুয়ে এসে চা খাবে।

যেতে যেতে চোখে পড়ে ভাসুর তাঁর ঘরে বসে আছেন লুঙ্গি পরে। এইমাত্র বোধহয় ঘুম থেকে উঠলেন।

চা খাচ্ছেন আর খবরের কাগজ পড়ছেন।

হাসি পায় কাজলের। আশ্চর্য! এক ভাইয়ের সঙ্গে আর এক ভাইয়ের এতটুকু মিলও নেই। দেখে অবাক লাগে। তবু লুঙ্গি পরে চা খেতে দেখতেই ও অভ্যস্ত তাই ভাসুরকেই ওর ভাল লাগে বেশী।

পেছন পেছন ঝি আসে শাড়ি তোয়ালে নিয়ে। কাজল কলঘরে ঢোকে।

কলঘর থেকে শাড়ি বদলে পরিষ্কার হয়ে ও ঘরে আসে আবার একটু পরেই। আসতে আসতে দেখতে পায় দোতলার ছাদের ওপরে ছোট একটি ঘর। ওইটেই বোধহয় ঠাকুরঘর। দেখতে পায় ঘরের শিকল তুলে দিচ্ছে রমাপ্রসাদ।

সদ্যস্নাত লম্বা শরীর। মুখখানি ভেজাভেজা স্নিগ্ধ সুষমায় ভরা। খালিগায়ে গলায় বুকে তিলক মাটির রেখা স্পষ্ট দেখতে পায়। দেখতে পায় উন্নত নাকের ওপর তিলক। দেখতে বেশ লাগে কিন্তু। সব মিলিয়ে যেন এক স্নিগ্ধ আরামের প্রলেপ পড়ে মনের ওপর।

ঘরে গিয়ে বসে। চা আসে। বড় জাও আসে।

—কী খাবে ডিম, না মিষ্টি ?

কাজল বলে, যা হোক দিন।

—ডিম দিই ?

—দিন।

—তোমার বর কী খাবে এখন জান তো ?

কাজল তাকায়।

—একটা আস্ত বেলের সরবত। আর প্রসাদী ফল।

কাজল চোখ তুলে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা দাদাও কি এ সব করেন ?

—রাম বল। তোমার দাদা তো পাষণ্ড বললেই হয়। সপ্তাহে দুদিন মুরগী চাই।

কাজল হেসে ফেলে।

—ওই জন্যেই তো তোমার দাদার সঙ্গে ঠাকুরপোর মাঝে মাঝে লেগে যায়। ঠাকুরপোর শরীর খারাপ হলে উনি গালাগালি করেন। প্রোটিন খাবে না, মাংস খাবে না, ডিম খাবে না শরীর টিঁকবে কেমন করে ?

—তাই নাকি ? কাজল কথা বলছে এবার।

—হ্যাঁ। ঠাকুরপোকে হয়তো হুকুম দিয়ে দিলেন, কাল থেকে একপো করে মাংস খাবি। বুঝলি ?

—ঠাকুরপো একটাও কথা বলল না। একটা গুণ আছে ভাই ওর। দাদার কথার ওপর কখনও একটা কথা বলতে শুনি নি আমি।

—তারপর মাংস খাওয়া হল ?

—খেপেছ। শেষকালে আমায় ধরে। বলে, বৌঠান দাদাকে বুঝিয়ে বলবেন। ও সব আমি খেতে পারব না।

—আপনি কী করলেন?

—কী আর করব? তোমার বরের জন্যে কি আমার কম জ্বালা! দুজনকে সামলাতে আমার জীবন যাবার দশা। এবার ভাই তুমি এসেছ। বুঝে সুঝে নাও।

কাজল চা শেষ করে কাপটা রাখে।

বড় জা আবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কয়েকদিন কেটে যায়। বড়জায়ের কাছে অনেক কথাই ধীরে ধীরে জানতে পারে কাজল। ওর ভাসুরের কথা, স্বামীর কথা, বিষয় সম্পত্তির কথা। আয়ের কথাও কিছু কিছু।

রমাপ্রসাদের সঙ্গে এ কদিন কোন কথাই হয় না। রাত্রে ও আগে শুতে আসে। শুয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করতে করতে ঘুম পেয়ে যায়। ও ঘুমিয়ে পড়ে।

তারপর কখন যে রমাপ্রসাদ এসে শোয় আর কখন ভোর না হতে বেরিয়ে যায়, ও টেরও পায় না।

রমাপ্রসাদ কি তাকে একবার আঙুল দিয়ে ছুঁতেও পারে না। ডাকতেও পারে না একবার!

এক এক সময় খুব রাগ হয় কাজলের! আচ্ছা মানুষ যা হোক। এর সঙ্গে ঘর করতে হবে আজীবন, ভাবতেও তো কেমন লাগছে। লোকটা কি পাথর? এত ঠাণ্ডা কিন্তু এত কঠিন!

সেদিন রাত্রে কাজল ইচ্ছে করে জেগে রইল। কিছুতেই ঘুমোবে না। বসে রইল খাটের ওপর। বারোটা বাজল। সাড়ে বারোটা বাজল। কিছুতেই ঘুমোবে না ও।

বসে রইল জোর করে।

পৌনে একটা যখন বাজে তখন দরজার কাছে পায়ের শব্দ পেয়ে ঝুপ করে শুয়ে পড়ল। ঘুমের ভান করে থাকবে ও। চোখত্নটো একটু ফাঁক করে দেখল, রমাপ্রসাদ দোর বন্ধ করে খাটের ওপর এসে বসল। মসৃণ স্নিগ্ধ গায়ে তখনও বিন্দু বিন্দু ঘাম। কি একটা কাজ করে এসেছে যেন।

ও শুনেছে, ঠাকুরকে শয়ন করিয়ে আসতে দেরি হয় রমাপ্রসাদের।

দেখল, রমাপ্রসাদ ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

—আমাকে আসতে দেখে কি ভয় পেয়ে শুয়ে পড়লে? মৃত্নু হাসি রমাপ্রসাদের ঠোঁটে।

কাজল প্রথমটা লজ্জায় সংকুচিত হল। পরমুহূর্তেই উঠে বসে রমাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে সহজ স্বরেই বলবার চেষ্টা করল, ভয় পাব কেন? ভয় আমি কাউকেই করি না।

রমাপ্রসাদ হাসল আবার। মানুষটার হাসিটি কিন্তু ভারী মিষ্টি।

বললে, না। দোর থেকে দেখলাম কিনা, টুপ করে শুয়ে পড়লে। আমার জন্যে বসে ছিলে এটা জানাতে এত লজ্জা কী?

যেন চোর-ধরা পড়েছে কাজল।

তবু বলতে চেষ্টা করে কাজল, তা নয়। ভেবেছিলাম দিদি আসছে হয়তো।

—অ! রমাপ্রসাদ আর কথা বলে না।

কাজল একটু এগোয় ওর দিকে।

শান্ত স্বরে বলে, ঠাকুর ঘর থেকে এলে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—রোজ রাত্রে ঠাকুর ঘরে যেতে হয়।

—ঠাকুরকে শুইয়ে তবে শুতে আসি।

কাজল হেসে ফেলে: আচ্ছা, ওই পুতুলটাকে শুইয়ে কি ভাব সত্যি সত্যি শুল সে?

—পুতুল! রমাপ্রসাদের টানাটানা চোখ ত্নটোয় বেদনা নামে।

চোখদুটো নিচু করে বড় করুণ স্বরে বলে, তুমি জান না, তাই তামাশা কর। ও যে কত জীবন্ত, কত সুন্দর তা তো জান না? কী করেই বা জানবে?

—জানব আবার কী? দেখতেই তো পাই।

—তুমি ভাল করে দেখেছ কখনও?

—কালও তো ঠাকুর ঘরে গিয়েছিলাম একবার।

—কেন?

—এমনিই।

রমাপ্রসাদের মুখখানি বড় করুণ দেখায়। আস্তে আস্তে বলে, তুমি কয়েকদিন আগে বলেছিলে না, তুমি একজন মানুষকে ভালবাস?

কাজল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়।

রমাপ্রসাদ বলে, তুমি তো জান না আমি একে কত ভালবাসি! মানুষকে ভালবাসার সঙ্গে সে ভালবাসার কোন তুলনাই পাই নে।

অন্তর থেকে অপার কারুণ্য নিয়ে যেন বেরুচ্ছে কথাগুলো। কাজল একটু সময়ের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়ে।

অতি সরল স্বীকারোক্তি। কোন ভেজাল নেই। এমন অতল বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে কষ্ট হয়। মায়া লাগে কাজলের। ও মায়াভরা চোখ তুলে তাকায় রমাপ্রসাদের দিকে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে পিঠের কাছে বসে। সস্নেহে বলে, পিঠখানা কেমন ঘেমেছে দেখ।

বলে রমাপ্রসাদের সাড়ার অপেক্ষা না করেই ওর পিঠের পোখরাজের মত বড় বড় ঘামের ফোঁটা সযত্নে মুছে নেয় হাতে। তারপর হাত আঁচলে মোছে।

রমাপ্রসাদ চুপ করে বসে থাকে।

কাজল ওর মসৃণ পিঠে হাতের নরম তালু বোলায়। ঠাণ্ডা পিঠখানা। চন্দন ধূপের গন্ধ পায় ও গায়ে। শীতল স্পর্শে কাজলের মনটাও ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এক অপরূপ আরামে মনটা ভরে ওঠে।

আস্তে আস্তে সরে ওর পাশে এসে ওর বিনম্র আনত চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে, তুমি কী খেলে আজ ?

অতি সাধারণ একটা প্রশ্ন।

রমাপ্রসাদ হাসেঃ ভাত খেলাম।

—কী দিয়ে খেলে ? আমরা তো মাংসের চপ খেলাম। ইলিস মাছ খেলাম। তুমি তো ওসব খাও নি ?

—না।

—কী খেলে তবে ?

—একটু ডাল আর ভাজা।

—দুপুরে ?

—দুপুরে ঠাকুরের প্রসাদ। তরকারি, ভাজা এই সব।

—দুধ খাও না ?

—মাঝে মাঝে খাই।

—তোমার কিন্তু রোজই দুধ খাওয়া উচিত।

—খেলেই হয়।

—তবে খাও না কেন ?

রমাপ্রসাদ হাসেঃ কি জান ? ভাল ভাল খাবার খাওয়া আমাদের বারণ।

—কেন বারণ ?

—শরীরের জন্য যেটুকু দরকার, তার বেশী খেতে নেই। লোভ বাড়ে।

কাজল একটু বিরক্ত হয়ঃ দুধটাও শরীরের জন্য দরকার।

—যখন দরকার বুঝি খাই। তুমি বুঝি জান না, সনাতন গোস্বামী মাধুকরী করে রোজ দুখানা রুটি সেঁকে খেতেন। ঠাকুরকে নিবেদন করবার সময় একদিন ঠাকুর রুটিতে কামড় দিয়ে বললেন, সনাতন তোর শুধু রুটি আর খেতে পারি নে, একটু নুন যদি দিতে পারিস। সনাতন বললেন, নুন কোথায় পাব ? সব ত্যাগ করে তোমার জন্যে মাধুকরী করে যা জুটিয়েছি, তাই তোমাকে খেতে হবে। কৃষ্ণ আর কী করবেন, ওই রুটিই খেলেন।

—কেন, রঘুনাথের কথা জান না ?

রমাপ্রসাদের চোখহুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কাজল বলে, তুমি বুঝি এসব খুব পড় ?

—শুধু পড়লে তো হয় না।

—তবে ?

—মন দিয়ে এ সব কথা জানতে হয়।

কাজল হেসে ফেলেঃ তোমার আবার মন আছে ?

রমাপ্রসাদও হেসে ফেলেঃ বেশ বলেছ। মনটা একেবারে ঠাকুরের পায়ে দিয়ে দিতে পারলে আর কিছুই থাকত না। তা আর পেরে উঠছি কই ?

কাজল হঠাৎ বলে, আচ্ছা, আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয় ?

রমাপ্রসাদ তাকায় ভাল করে কাজলের দিকে। ওর চোখের লোভানি ওকে একটু সময়ের জন্যে আকর্ষণ করতে চায়। কাজলের হাতখানা তখনও ওর পিঠে। কাঁধের ওপর বুকটা হেলিয়ে বসেছে কাজল।

ওর নরম বুকের ওঠানামা স্পষ্ট বুঝতে পারে রামপ্রসাদ।

কাজল অপরূপ ভঙ্গীতে হাসতে থাকে। পরম লোভনীয় করে তোলে ওর যৌবনের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ।

রমাপ্রসাদ একটু সরতে চায়।

কাজল আরও ঘেঁষে বসে। গায়ে গা দিয়ে।

রমাপ্রসাদ এবার ওর একটা হাত ধরে। কাজল আরও চঞ্চল হয়।

রমাপ্রসাদ বলে, তুমি আমার ঠাকুরকে ভালবাসতে পারবে ?

কাজল বলে, তাকে জানলুম না, ভালবাসব কী করে ?

রমাপ্রসাদ গম্ভীর স্বরে বলে, আমার সব কথা যদি মানতে পার, তবে জানতে পারবে। আর ভালবাসতে পারলে তোমার মনের সব কষ্ট ধুয়ে যাবে। সেই যে একজন মানুষকে ভালবাসতে, তার ভালবাসা ধুয়ে মুছে যাবে ঠাকুরকে ভালবাসলে।

সেই মানুষটা! মানে অজয়! মুহূর্তে কাজল সরে বসে তফাতে। গম্ভীর হয়ে ওঠে। কাজল নিজেকে আবার কঠিন করে তোলে। ছিঃ ছিঃ, মুহূর্তের দুর্বলতায় কী করে বসছিল সে! একটা পাগলের প্রলাপ শুনছিল এতক্ষণ। অজয়ের কাছে তো এখনও একে অতি ছোট মনে হয়। কী করে সে এতক্ষণ এই লোকটার এত ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছিল!

রমাপ্রসাদ একবার তাকায় ওর দিকে। আবার একটু হাসে মাত্র। ঠাকুর আজ ওকে বাঁচিয়েছেন। কাজলের তপ্ত শরীরের স্পর্শে ওর জ্বালা ধরেছিল, তাই হয়তো ঠাকুরই ওকে সরিয়ে নিলেন।

কাজল আর কোন কথা না বলে শুয়ে পড়ে।

রমাপ্রসাদ বসে থাকে কিছুক্ষণ। কাজলের তপ্ত স্পর্শের স্মৃতিটা মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে। কৃষ্ণ চিন্তায় কিছুক্ষণের জন্যে ডুবিয়ে দেয় মনকে।

তারপর শান্ত মনে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ে।

এরপর আবার কিছুদিন নীরবেই কাটে। রমাপ্রসাদ ওর নিজের মত চলে। অপ্রয়োজনে একটা কথাও বলে না কাজলের সঙ্গে। কাজলও কোন কথা বলে না পারত-পক্ষে। দু-একটা কথা এক আধদিন যে না হয় তা নয়। কিন্তু সে অতি অল্প। কাজল বেশীর ভাগ সময়ই গল্প করে ওর ভাসুরের সঙ্গে! সিনেমা যায় জায়ের সঙ্গে। বেড়াতে যায় ভাসুর জাকে নিয়ে। আনন্দে কোলাহলে মুখর করে রাখতে চায় দিনরাত।

আর রমাপ্রসাদ শান্ত নীরব। বেশীর ভাগ সময়ই ওর কাটে ঠাকুর ঘরে। ধ্যান ধারণায়, নাম কীর্তনে, ভাগবত, চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত পাঠ করে পরম আনন্দে ডুবে আছে রমাপ্রসাদ। নির্জন শীতল আনন্দ। ওর মনকে ছুঁয়ে দেখবার মত শক্তিও কাজল পায় না।

মাঝে মাঝে কাজল ঠাকুর-ঘরে আসে লুকিয়ে। কেন যে আসে বুঝতে পারে না। দেখে রমাপ্রসাদ বসে আছে আসনে। মৃদু স্বরে নাম কীর্তন করে চলেছে। এত মধুর সুর। এই সুরের আকর্ষণেই কি আসে কাজল? রমাপ্রসাদ দুলছে। অন্তরের পরম আবেগে কারুণ্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে! দু-গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। ধূপ চন্দনের গন্ধে আর নামের আবেশে কাজলও যেন অজ্ঞাত এক স্থিত শান্ত প্রাণারাম অনুভব করতে থাকে। সদ্যস্নাত রমাপ্রসাদের চোখের-জলে-ভেজা মুখখানা দেখে বুকটা ওর সম্পূর্ণ অপরিচিত এক আবেশে ভরে উঠতে চায়।

নাম কীর্তন থামতেই পালায় কাজল। রমাপ্রসাদ দেখতে পায় না।

আবার সিনেমা থিয়েটারে আর ঠাট্টা তামাশায় ও ভাবটা একেবারে ভুলে যায় কাজল।

কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। ও স্পষ্টই বুঝতে পাচ্ছে যে রমাপ্রসাদকে ও কিছুমাত্র আকর্ষণ করতে পারছে না। কতদিন হয়ে গেল, একটা আঙুল দিয়ে ওকে একবার ছোঁয়ও না রমাপ্রসাদ। কাজলের উত্তপ্ত যৌবন তো কোন মেয়ের চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়। রমাপ্রসাদের মত একটা মানুষকে টেনে রাখবার মত সুতীব্র টান তার যৌবনে আছে। .

অজয়ের মত প্রতিভাদীপ্ত একটা ছেলে কাজলের আকর্ষণে কাজলের কাছে একান্ত হয়ে রইল। আর রমাপ্রসাদ তো তার কাছে কিছুই নয়! অজয়ের ভালবাসা কাজল আজও ভুলতে পারে নি।

রমাপ্রসাদকে ভালবাসতে ও হয়তো পারবে না। কিন্তু স্বামীর সাহচর্য পেতে যে চায় এটাই বা অস্বীকার করে কী করে? আজ ওর মনে হয় ভালবাসা আর বিয়ে দুটো বোধহয় আলাদা। কয়েক মাসেই ও বুঝতে পারছে যে রমাপ্রসাদকে অস্বীকার করে ওর লাভ কিছু হবে না।

আর একটা জীবনকে ওর মেনে নিতেই হবে।

জীবনের এ দিকটাও ওকে মেনে নিতে হবে। উপবাসী হয়ে ঠকতে সে রাজী নয়।

ও সহ্য করতে পারছে না রমাপ্রসাদের অগ্রাহ্য ভাব। রমাপ্রসাদ যেন হাসতে হাসতে ওর যৌবনকে অপমান করে চলেছে। এটা সে হতে দেবে না। কিছুতেই নয়।

অনেকদিন পর তাই সেদিন রাত্রে ও ইচ্ছে করেই ঘুমন্ত রমাপ্রসাদকে আস্তে আস্তে ঠেলা দিল। একটু সঙ্কোচ যে না হল তা নয়। তবু ভেতরের এক অদম্য বেগ ওকে অস্থির করে তুলেছে।

রমাপ্রসাদ জাগল। আস্তে আস্তে ওর দিকে মুখ করে দেখল: কিছু বলবে?

কাজল রাগ দেখিয়ে বলে, এতটা জায়গা নিয়ে শুলে আর একজন কী করে শোয়!

—অ। রমাপ্রসাদ হাসে: আমি না হয় খাট থেকে নীচে নেমে শুই?

কাজল তাড়াতাড়ি বলে, আমি কি নীচে নেমে শুতে বলছি নাকি?

রমাপ্রসাদ আর একবার হাসল শুধু।

—মানুষের সঙ্গে কথা বললেও কি তোমার রাধারানী রাগ করেন?

আরও একবার হাসল রমাপ্রসাদ।

কাজল এবার বেশ জুত করে রমাপ্রসাদের গা ঘেঁষে এগিয়ে আসে। ফিসফিস করে বলে, একটা কথা বলছিলাম!

—কী?

—কিছুদিন ধরে যা দেখলাম, তাতে মনে হচ্ছে তোমার দাদার হাতের মুঠোয় পড়ে গেছ তুমি। বিষয়-সম্পত্তি কি কখনই কিছু দেখাশোনা কর না?

—সবই তো দাদা দেখেন।

—দাদা তো বেশ গুছিয়ে নিচ্ছেন, তা জান? মেদিনীপুরের সম্পত্তির আয় কত জান?

—জানি না।

—এ বছর সাড়ে আটহাজার টাকা পাওয়া গেছে।

রমাপ্রসাদ কাজলের উষ্মা দেখে হাসে: তুমি কি করে জানলে?

—অনেক কিছুই তো কানে আসে। ওই জন্যেই তো দিনরাত ওদের সঙ্গে অত মিশি। সব খবর বার করতে হবে তো। তুমি তো কিছুই জান না। আমার না জানলে কি করে চলবে?

—বেশ তো, সব না হয় তোমার নামেই লিখে দিই।

—আমি কি তাই বলছি নাকি? একটা কথা বললেই উলটো মানে কর।

ধর্ম নিয়ে থাকলে যে ঠকতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। সবাই তো তোমায় ঠকায়।

রমাপ্রসাদ আস্তে আস্তে বলে, আমার তো মনে হয়, আমিই জিতছি। যা পেতে চাই, তা যদি পাই, তবে পাওয়ার আর বাকী রইল কী?

একটু থেমে বলে রমাপ্রসাদ, তোমার ভেতরে কিন্তু একটা অস্বস্তি লক্ষ্য করছি। আমার মনে হয়—।

চোখ তোলে কাজল।

—আমার মনে হয়, তুমি আমার কাছে কিছু চাও।

কাজল কি করে আর একথা অস্বীকার করবে আজ। আস্তে আস্তে রমাপ্রসাদের বুকের কাছে মুখটা নামিয়ে আনে। ওর উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করে রমাপ্রসাদ।

—তুমি কি সন্তান চাও?

কাজল ওর বুকের ওপর গাল রাখে। মুখটা লুকোয়।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে রমাপ্রসাদ, বেশ, তাই হবে। তাঁর ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু—।

কাজল কান পেতে শোনে।

—কিন্তু একটি সন্তান। তারপর আমার সব বিষয় সম্পত্তি তোমার নামে লিখে দিয়ে আমি অন্য কোথাও চলে যাব। আমার ভেবে অবাক লাগছে যে এ-কথা যেন আমি বহুদিন আগেই জানতাম।

কাজল বেশী-কথা আর শুনতে চায় না। ওসব বাজে কথা অনেক পুরুষই বলে থাকে। সংসার ফেলে চলে যাব। বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে যাব। ওসব কথার কথা। কেমন যায় তখন দেখা যাবে।

—তা ছাড়া।

কাজল ওর বুকের ওপর নিজের মুখটা আস্তে আস্তে ঘষে।

থাক, আজ নয়, পরে বলব।

তারপর তো মাত্র তিনটে বছর কাটল। তিনটে বছর পরে যে আবার কাজলের জীবনে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাবে ভাবতেও পারে নি ও। ও কি ধারণা করতে পেরেছিল যে রমাপ্রসাদের মত এক তিলক-আঁকা নিরীহ পুরুষও ওর জীবনের পাতায় ছাপ ফেলে যেতে পারে? আর সে ছাপ মোছা যায় না!

ও কি ভাবতে পেরেছিল যে রমাপ্রসাদকেও ওর ভালবাসতে হবে। জীবনে একজন নয়, ত্বজন পুরুষকেও ভালবাসা যায়! কিছুই বুঝতে পারে নি প্রথম প্রথম।

সংসারে এমনিই হয়। ত্বদিন পরে কী হবে কেই বা ভেবে ঠিক করতে পারে!

রমাপ্রসাদের শান্ত চোখের প্রগাঢ় নির্লিপ্ততা ওকে যেন সবেগে আকর্ষণ করছিল ওর দিকে। সম্পূর্ণ একান্ত করে ওকে পেতে হবে। কাজল ওকে যৌবনের জালে জড়িয়ে ফেলতে চায়। কোন মেয়েই বা না চায়?

অগ্রাহ্য করে এ নির্লিপ্ততাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। বিক্ষুব্ধ হলে চলবে না। একে জয় করতে হবে নিজের অধিকারে।

সেদিন রাত্রে তাই রমাপ্রসাদ যখন ঘরে এসে শুল ওর পাশে, সঙ্কোচে একপাশে সরে। কাজল এগিয়ে এল। দুহাতে জড়িয়ে ধরে ওর মুখখানা নিজের কাছে টেনে নিলে।

মৃদু আপত্তি জানাল রমাপ্রসাদ, গরম লাগছে।

—লাগুক।

—কেমন হাঁসফাঁস করছে।

—করুক।

রমাপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে।

—না।—বলে আরও কাছে টেনে নেয় ওকে কাজল।

তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে, একটা কথা বলব ?

—বল ?

—তুমি আমার কাছে যখন আসবে নাকের গায়ের ওই আঁকি-বুকি ছবিগুলো মুছে এস। কী যে ছবি আঁক নাকে মুখে ?

রমাপ্রসাদ হেসে ফেলে : যা বলেছ আঁকাই বটে ! শিল্পী না হলে কি বৈষ্ণব হয় !

কাজলও হাসে : আমি তো শিল্পী নই। আমি মাছ, ডিম, মাংস খাই। আমার ও-গুলো ভাল লাগে না।

—কেন ?

—ও-গুলোর কোন মানে হয় না।

—মানে হয়। তোমাকে বলতে পারি। তুমি আমার স্ত্রী। আমাদের নাসাগ্রে ধ্যান করতে হয়, তাই এই তিলক ধ্যানে অনেক সাহায্য করে। এসব সাধনের গোপন কথা।

—তবে ধ্যানের সময় এঁকো ওসব।

বলে আঁচল দিয়ে নাকের তিলক মুছে দেয় কাজল।

রমাপ্রসাদ ম্লান মুখে চুপ করে।

কাজল খিলখিল করে হাসে, এরপর একদিন টিকিটাও কেটে দেব। দেখ সত্যি, তুমি যখন ঘুমোবে, কাঁচি দিয়ে কেটে দেব।

রমাপ্রসাদ বিষণ্ণ মুখেও হাসে ঃ আর কি করবে ?

—তুলসীমালাটা ছিঁড়ে দেব।

—তারপর ?

—তারপর একদিন মাংসের সিঙাড়া তৈরী করে খাওয়াব।

খিলখিল করে হাসে কাজল।

রমাপ্রসাদ বলে ধীরে ধীরে, তুমি যদি চাও, তবে তোমার সব কথাই আমায় মেনে নিতে হবে। কিন্তু কেন তুমি চাইবে সেইটেই বুঝতে পারছি না।

—কেন, মাংস খেলে কী হয় ?

—কিছুই হয় না। রজোগুণ বাড়ে। দেখ না, খুব যারা মাংস, পেঁয়াজ, ডিম খায়, সব সময় তারা গরম হয়েই থাকে। কথায় কথায় লাল হয়ে রেগে ওঠে। অহঙ্কার ভয়ানক বেড়ে যায় ওতে।

—তা গরম হলেই বা।

—গরম হলে রাগ বাড়বে।

—বাড়ুক।

—রাগ বাড়লে মোহ বাড়বে। তারপর পুরো অজ্ঞানের মত আবোল-তাবোল কাজ করবে। তমোতে ডুবে যাবে।

কাজল কথায় পারে না। বলে, অত বুঝি নে। কই আমার রাগ কই ? আমি ত মাংস ডিম সব খাই।

রমাপ্রসাদ বলে, তোমার তৃষ্ণার শেষ নেই। তুমি তা বোঝ না। আমি বুঝি।

—কিসের তৃষ্ণা ?

—কামের, লোভের। যা চাই তা তোমাকে পেতেই হবে। না পেলেই তোমার রাগ আসবে মনে।

কাজল কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবে। তারপর রমাপ্রসাদকে দু হাত দিয়ে নিজের কাছ থেকে ঠেলে দেয়।

রমাপ্রসাদ হেসে ফেলে, কি হল। অমনি রাগ হল তো ?

—কই রাগ তো হয় নি।

—ভাল করে ভেবে বল।

—ভেবেই বলছি। রাগ আমার হয় নি।

—নিশ্চয়ই হয়েছে। তুমি যা চাও, তা ঠিক মত পাচ্ছ না বলেই রাগ হচ্ছে। শোন।

রমাপ্রসাদ এবার ওকে কাছে টানে। কাজল জোর করে ওকে সরিয়ে দেয়। রমাপ্রসাদ দু হাতে ওকে কাছে টানে। জোরে ও পারে না। শুধু তাই নয়। একটু জোর করবার পর আর যেন জোর করতেও চায় না। রমাপ্রসাদ যে ওকে কাছে টেনে নিচ্ছে, এতে ওর ভালই লাগে।

আস্তে আস্তে গা এলিয়ে দেয়। রমাপ্রসাদের বুকের কাছে মুখ নেয়।

—শোন বলি। বলে রমাপ্রসাদ, তোমার কোন অন্যায় হয় নি। স্বামীর ওপর এটুকু অধিকার তুমি চাইতে পার। দোষ আমারই। আমিই হয়তো আমার অবস্থাটা তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি নে।

কাজল ছেলেমানুষের মতই বলে, তুমি কেন আর সকলের মত হবে না ?

—হতে আর পারলুম কই।

—চেষ্টা করলেই পার। তোমার দাদা কেমন তোমার বৌঠানকে নিয়ে কত জায়গায় বেড়াতে যায়। কত ঠাট্টা, তামাশা, হাসি গল্প। আমার দেখে কেমন লাগে বল তো ?

—আমার ভুল হয়েছে। দাদার মত হতে যে আমি কিছুতেই পারছি নে। কী করি বল তো ?

—আমি যা বলি, তাই শোন।

—শুনব।

—কাল আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে ?

—যাব।

—যা খেতে বলব, খাবে?

—চেষ্টা করব।

কাজল ধীরে ধীরে রমাপ্রসাদকে সম্পূর্ণ বশে আনবার চেষ্টা করে। রমাপ্রসাদকে স্বীকার করতেই হয় শেষ পর্যন্ত। আশ্চর্য! কাজল নিজেই আশ্চর্য হয়। মানুষটা তার বশে কিন্তু ঠিকই আসছে। কি অবাক ক্ষমতা তার! বোধকরি সব মেয়েরই!

মেয়ে হয়ে জন্মে এ সাফল্য না এলে বৃথাই যৌবন।

—তুমি কিন্তু তিলক না পরে পারবে না।

—তাও পারব।

—এবার তুমি রাগের কথা বলছ।

—কখনও আমাকে রাগ করতে দেখেছ?

—না, দেখি নি।

—তবে? আমি সবই মেনে নিচ্ছি। কারণটা আর কিছুই নয়। তোমার কোন সাধ অপূর্ণ রাখা আমার উচিত নয়। তা সে যে ক-দিনের জন্যেই হোক।

—যে ক-দিনের জন্যে মানে?

রমাপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বলে, বলেছি তো চিরকাল হয়তো আমি তোমার কাছে থাকতে পারব না। আমাকে যেতেই হবে সময় হলে।

—কোথায়?

—তা আর বলি কি করে। তবে যেতে যে হবে এর ভেতর এতটুকুও সন্দেহ নেই।

কাজলের ভয় ভয় করে। শেষকালে বেশী বাড়াবাড়ি করলে মানুষটা যদি সত্যিই কোথাও চলে যায়! বলা যায় না। যে জীবনে সে অভ্যস্ত নয়, সে জীবন যদি জোর করে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার সহিষ্ণুতার বাঁধও ভেঙে পড়তে পারে।

তার চেয়ে বরং ধীরে ধীরে একটু একটু করে নিজের মত করে

নেওয়া ভাল। আস্তে আস্তে অভ্যাস করিয়ে নিতে হবে। হঠাৎ হেসে ওঠে কাজল।

—কী হল? হাসলে যে?

—বাব্বা! রাগের বহর দেখ। আবার বলেন আমার রাগ নেই।

রমাপ্রসাদ চুপ করে থাকে।

—শোন।

রমাপ্রসাদ নীরব।

—শুনছ! কাজল রমাপ্রসাদের থুতনিটা ধরে।

—বল।

—থাক, তোমার কাঠের মালা ছিঁড়ব না। হল তো?

কথা বলে না রমাপ্রসাদ।

—মাংসও তোমার খেতে হবে না। মাংসের সিঙাড়া করতে আমার বয়ে গেছে।

রমাপ্রসাদ ওর মুখের দিকে তাকায়।

—না তিলক পরেই এস ঘরে। তিলক পরলে তোমাকে কিন্তু ভারী সুন্দর মানায়।

—এবার কি উলটো চাপ দিচ্ছ। রমাপ্রসাদ বলে।

কাজল হেসে ওঠে: না গো, না। বেড়াতে নিয়ে যেতে আমাকে হবে কিন্তু। রাস্তায় বেরোবার আগে কিন্তু তোমার তিলক আমি মুছে দেব।

—তা দিয়ো। বললুম তো তোমার যা ইচ্ছে, কোর।

—তোমার ইচ্ছে সব জলাঞ্জলি দিতে হবে না তাই বলে। আমি কি তাই বলেছি?

রমাপ্রসাদ বলে, তোমার কথা শুনে আমার কী মনে হচ্ছে জান?

কাজল তাকায় ওর দিকে।

—মনে হচ্ছে তুমি একদিন না একদিন আমার পাশে এসে দাঁড়াবে।

কাজল হাসে, পাশেই তো আছি।

—তা নয়। তোমার সব কিছু ত্যাগ করে আমার ঠাকুরকেই তোমাকে ভালবাসতে হবে।

—তুমি কি জ্যোতিষী জান? তুমি যা বলছ তা না হতেও তো পারে।

—কিছুতেই পারে না। হতে পারে না।

ওর দৃঢ়তায় কাজল এবার একটু অবাক হয়।

—কী করে বুঝলে?

রমাপ্রসাদের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আনন্দে। ও কাজলের মুখখানা দু হাতের তালুতে ধরে বলে, তা নইলে ঠাকুর তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতেন না।

কাজলের কিন্তু হাসিই পায় রমাপ্রসাদের অদ্ভুত বিশ্বাস দেখে।

হাসতে হাসতে বলে, তবে কি বলছ, কাল থেকেই ঠাকুরঘরে যাব?

—আজ আমি 'হ্যাঁ' বললেও তুমি যাবে না, আমি জানি। কিন্তু একদিন আসবে যেদিন আমি 'না' বললেও তুমি শুনবে না। ঠাকুরের কাছেই তোমাকে যেতে হবে।

হাসিই পায় আবার কাজলের: তবে বরং কাল থেকে রিহার্সাল শুরু করি। চন্দন বাটা, মালা গাঁথা। আর যেন কি? প্রদীপ দেওয়া। কি বল?

রমাপ্রসাদও হাসে: ঠাট্টা কোর না। যা বললাম তা সত্যি।

—সে যখন হবে, তখন হবে। আমার ঘুম পাচ্ছে।

বলে কাজল রমাপ্রসাদের হাত দুটো নিজের মুখ থেকে টেনে নিয়ে দুহাতে চাপে। খুব জোরে চাপে।

—হাতে লাগছে।

চোখ বুজে লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে কাজল। ভাগ্যিস ঘরটা অন্ধকার। ভাগ্যিস রমাপ্রসাদ দেখতে পায় নি, কাজলও লজ্জায় রাঙা হয়! মানুষটা কী!

দিনকয়েক কেটে গেছে তারপর। রমাপ্রসাদ আবার নির্বিকার। ওর নির্লিপ্ততাকে কোন মতেই ভেঙে ফেলতে পারে না কাজল। বশে আর কিছুতেই আসে না। বিকেলে রমাপ্রসাদ সেদিন ঘরেই ছিল। একখানি আসনে বসে ভক্তমাল পড়ছিল। চোখে নিবিষ্টতা। মুখে প্রশান্তি। খালি গা। ছোট একখানি কাপড় শুধু পরনে।

কাজল ঘরে আসে, একটু উস্‌খুস্‌ করে। খাটের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ে। আবার নামে।

রমাপ্রসাদ নির্বিকার। ঘরে যে কেউ এসেছে এইটেই যেন টের পায় না।

কাজল ইচ্ছে করে রমাপ্রসাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে গিয়ে ওর কাঁধে নিজের হাঁটুটা লাগায়।

রমাপ্রসাদ তাকায়।

কাজল ফিক করে হেসে বলে, লাগল ?

—না।

আবার রমাপ্রসাদ বইয়ে মন দেয়।

ভাল জ্বালা হল দেখছি ! কাজল ভেতরে ভেতরে ভীষণ বিরক্ত হলেও মুখে কিছু প্রকাশ করে না আর।

চুল বাঁধতে বসে। চুল বাঁধা শেষ হলে মুখের প্রসাধন শেষ করে। চোখের পাতায় আলতো করে একটু কাজল ছোঁয়ায়।

একখানা ভাল শাড়ি বার করে আলমারি থেকে। বার বার শাড়িখানা উলটে পালটে পরতে চেষ্টা করে। তারপর রমাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বলে, শুনছ ?

রমাপ্রসাদ শুনতেই পায় না।

—কই শুনছ !

—বল। এতক্ষণে চোখ তোলে রমাপ্রসাদ।

—কেমন মানিয়েছে দেখ তো।

—বেশ।

আবার রমাপ্রসাদ ভক্তমালের খোলা পাতায় চোখ নামায়।

কাজল এবার ওর পাশে এসে বসে। বইখানা বন্ধ করে দেয়।

অবাক হয়ে তাকায় রমাপ্রসাদ ঃ কী হল?

—হবে আবার কি?

ভাল করে তাকায় রমাপ্রসাদ ঃ বাঃ! সত্যি বেশ মানিয়েছে।

—থাক। ওসব কথা আর শুনতে চাই নে। তুমি ওঠ।

—কেন?

—আজ বিকেল আর সন্ধ্যেটা নষ্ট করতে দেব না তোমায়।

রমাপ্রসাদ হাসল।

—চল। ওঠ।

—উঠে কী করব?

—কাপড় জামা পরবে। বার করে রেখেছি খাটের ওপর।

—তারপর?

—বেড়াতে বেরোব তোমাব সঙ্গে আজ।

—কোথায়?

—বৃন্দাবনে। বলেই ফিক করে হেসে ফেলে কাজল।

রমাপ্রসাদ বলে, যাবে? সত্যিই চল না একবার বৃন্দাবনে।

—গিয়ে কী করব?

—দুজন থাকব একটি গুম্ফা করে। না হয় তো একটি ছোট চালাঘরে। ভোরে উঠে যমুনায় স্নান করে এসে বসব দুজন। তিলক এঁকে নাম গুনগুন করতে করতে পুজো সারব। তারপর বেলায় বেরোব মাধুকরী করতে।

—মাধুকরী কী?

—ভিক্ষে। মানে মৌমাছি যেমন পাঁচফুল থেকে মধু সঞ্চয় করে তেমনি পাঁচঘরে রাধা নাম করতে করতে দোরগোড়ায় দাঁড়ালেই কিছু পাওয়া যাবে। তাতে চলে যাবে আমাদের দু জনের।

কাজল অবাক হয়ে দেখে রমাপ্রসাদের চোখে স্বপ্ন।

—আমার বহুকালের আশা। এমনি করে বৃন্দাবনে গিয়ে যদি একটা দিনও কাটাতে পারি, সে দিনটাই জানব জীবনের সবচেয়ে শুভদিন। কী সুন্দর বল তো! কৃষ্ণ ভাবনা, কৃষ্ণ চিন্তা, যা জোটে তাই খাওয়া, আর দিবারাত্র প্রেমের মধুতে ডুবে থাকা।

—সত্যি, তুমি এই চাও?

—সত্যি, আমি এই চাই। ধন নয়, মান নয়। বৃন্দাবনের এককোণে আপন মনের আনন্দে ডুবে থাকা।

ভাবতে কাজলেরও কিন্তু বেশ কেমন আরাম লাগে। আশ্চর্য শিল্পীমনের কথাই বলছে তার স্বামী। ও কি সত্যি মনে মনে এত বড় শিল্পী। ঠাট্টা করে বলেছিল একদিন শিল্পী না হলে কি বৈষ্ণব হওয়া যায়। কথাটা বার বার ওর মনে পড়ে আজ।

মনে পড়ে অজয়ের কথা। অজয়ের সঙ্গে এর কোন একটা জায়গাতেও মেলে না।

অজয় মানুষ, আর এ এক আশ্চর্য মানুষ!

অজয়কে ভালবেসে যে মত্ততার স্বাদ পেয়েছিল কাজল, সেটা এর কাছে একেবারেই পাওয়া যায় না।

অজয়কে আঘাত করে নিজে জ্বলেছিল, অজয়কে কাঁদিয়েছিল।

আর একে আঘাত করলে সব আঘাত নীলকণ্ঠের মত ধারণ করেও হাসতে থাকে।

কাজল বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে কিছুক্ষণের জন্যে।

রমাপ্রসাদের পায়ের ওপর একটা হাত রেখে বলে, আচ্ছা, নাম-কীর্তন করে তুমি কী পাও?

—কী পাই? চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রমাপ্রসাদের, কি করে তোমায় বোঝাই। সমস্ত পৃথিবীর সব টাকা আর সব মেয়ে আমার কাছে যদি আসে, যদি পাই, তাতে যে আনন্দ হবে, সে আনন্দ শ্মশানের ছাই বলে মনে হবে কৃষ্ণ নামের আনন্দের কাছে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে মানুষটাকে দেখছিল কাজল। অনেক বড় কিছু

লাভ না করলে এত বড় ত্যাগের কথা চিন্তা করাও যায় না। তবু কাজলের কাছে অবোধ্য মনে হয়।

—কি করে বোঝাই বল। যে এ আনন্দ পায় নি তাকে বোঝান যাবে না। বললে হাসবে, তামাশা করবে। পাঁচ বছরের মেয়েকে কি রমণের আনন্দ বোঝান যায়? এও তেমনি। তুমি মিছিমিছি বোঝবার চেষ্টা কোর না। সময়ে হয়তো বুঝতে পারবে।

কাজল এতক্ষণে ওর নিজের সত্তায় ফিরে আসে: যা বলেছ। ওসব বোঝবার আমার কোন দরকার নেই। বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করলে। নাও ওঠ।

রমাপ্রসাদ কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকে।

—চল, বেড়াতে যাবে না?

—কোথায় যাবে?

—সে বেরিয়ে ঠিক করা যাবে।

—তোমার মায়ের কাছে যাবে?

—মায়ের কাছে কি কোনও দিন যাই?

সত্যিই বাপের বাড়ি কাজল বেশী যায় না। ইদানীং একেবারেই যায় না।

—তবে কোথায়?

—চলই না।

কাজল রমাপ্রসাদের হাত ধরে টানে। রমাপ্রসাদ মুখটা ম্লান করে বলে, কিন্তু ঠাকুরের আরতিটা হবে না? উনি একলা থাকবেন?

—আর আমি যে একলা থাকি, সেটা বুঝি কিছু নয়?

রমাপ্রসাদ হাসে: আচ্ছা, আমি না হয় চট করে সেরে আসি।

কাজল এবারে রীতিমত রেগে যায়: থাক দরকার নেই বেরিয়ে।

রমাপ্রসাদ ওকে কেন যে এত অবহেলা করে! রাগে উঠে পড়ে শাড়িটা তক্ষুনি ছেড়ে ফেলে কাজল।

রমাপ্রসাদ ওঠে। আস্তে আস্তে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

—রাগ করলে কেন?

কাজল একটা কথাও বলে না।

রমাপ্রসাদ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে ঠাকুর ঘরের দিকেই চলে যায়।

কাজল গালে হাত দিয়ে গুম হয়ে বসে থাকে।

একটু পরেই রমাপ্রসাদ ঘরে আসে।

—চল এবার।

কাজলের চোখ দুটো যেন জ্বলতে থাকে।

রমাপ্রসাদ ওর পিঠে হাত রাখে: চল, ওঠ।

—যাও। এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

—রাগ কোর না।

ওকে দুহাত ধরে টেনে ওঠায় রমাপ্রসাদ।

—আঃ ছাড় বলছি!

রমাপ্রসাদ হাসতে হাসতে কাজলকে টেনে নিজের কাছে দাঁড় করায়।

এও আশ্চর্য! বেশ ভালই লাগে কাজলের। মাঝে মাঝে ও এত ভাল হয়ে যায়। আস্তে আস্তে রাগটা পড়ে আসে।

—আমি কিন্তু গাড়িতে যাব।

রমাপ্রসাদ জামা-কাপড় ছেড়ে নিজের মনেই বলে, আমার কাছে তো টাকা নেই। ও বৌঠান!

কাজলের বড় জা আসে।

—কি গো ডাকছ কেন? এ কি সেজেগুজে কোথায় চললে?

রমাপ্রসাদ মাথা চুলকে বলে, গোটা কুড়ি টাকা দাও।

ওর বড় জা তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকায়।

—কী হল, কী দেখছ?

—দেখছি, অমাবস্যেতে চাঁদ উঠল কিনা। বলতে বলতে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ে।

কাজলকে বলে, নমস্কার ভাই তোমাকে। ঠাকুরঘর থেকে যে রাস্তায় বার করতে পেরেছ, এ না দেখলে আমি বিশ্বাস করতুম না। দেখ, ঠাকুরপো, কাজলের হাত ধরে যেয়ো। আবার হারিয়ে না যাও।

আবার হেসে ওঠে।

কাজলও ওর বলবার ভঙ্গিতে হেসে ফেলে।

—কই টাকাটা দাও। রমাপ্রসাদ নিতান্ত অনভ্যস্তের মত বলে।

বড় জা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই কাজল হাসতে হাসতে খাটে গড়িয়ে পড়ে।

—তোমরা সব হাসছ কেন? একটু যেন বিব্রত বোধ করে রমাপ্রসাদ।

একটু পরে বৌঠান এসে দশ টাকার পাঁচখানা নোট রমাপ্রসাদের হাতে দেয় না। কাজলের হাতে দেয়।

—বেশী টাকা রইল। দেখো, দেওরটিকে ভালয় ভালয় ফিরিয়ে এনো। হারাতে পারে, আছাড় খেতে পারে, গাড়ি চাপা পড়তে পারে!

আবার হাসির রোল।

রমাপ্রসাদও হেসে ফেলে এবার: তা যা বলেছ বৌঠান। আমার এসব মানে কি জান—ঠিক হয়ে হয় না।

ওরা আরও হাসতে থাকে।

শেষের বছরটা বেশ ভালই কাটছিল। বিয়ের তৃতীয় বছর। ইদানীং রমাপ্রসাদের ওপর রীতিমত জোরও করত কাজল। বিশেষ দ্বিধা করত না কোন কথা বলতে। কাজল যেন অনেক সহজ হয়ে আসছিল রমাপ্রসাদের কাছে।

রমাপ্রসাদ এত সহজ মানুষ না হলে ও অজয়ের জ্বালা ভুলে

এতটা সহজ হতে হয়তো পারত না। রমাপ্রসাদকে এত ছেলেমানুষ মনে হয়, এত সরল মনে হয় যে ওকে ভাল না বেসে পারা যায় না।

তার ওপর সবচেয়ে বড় যেটা ওর মনে ছাপ দিয়েছে, সেটা রমাপ্রসাদের কথার, ব্যবহারের অবাক নির্লিপ্ততা। ওইটেই ওকে এই সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে তিলে তিলে রমাপ্রসাদের দিকে আকর্ষণ করেছে। একটু একটু করে কখন যে ওকে ভালবাসতে শুরু করেছিল, নিজেও হয়তো কোনদিনই বুঝতে পারত না, যদি না সেদিন রমাপ্রসাদ ওকে এমন করে ছেড়ে চলে যেত।

বছরের মাঝামাঝি বোঝা গেল কাজল সন্তান-সম্ভবা। কথাটা রমাপ্রসাদকে কাজলই প্রথম বলল।

রমাপ্রসাদ সেদিন রাত্রে যখন ঘরে এল, দেখলে কাজল বমি করছে জানালার ধারে নর্দমাটার কাছে।

ও এসে তাড়াতাড়ি কাজলের কাঁধ ছুটো ধরলে, কী হল ?

কাজল ক্লান্ত হয়ে ওর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলে, এলিয়ে দিল দেহটা।

—কী হল বলতো ? খাওয়া-দাওয়ার কিছু গোলমাল হয়েছে ?

—হ্যাঁ। বলে হেসে ফেললে কাজল।

রমাপ্রসাদ ওকে ধরে খাটের কাছে নিয়ে এল। ব্যস্ত হয়ে বললে, দাদাকে ডাকব ? ডাক্তার আনাব ?

কাজল খাটের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বললে, আমার পাশে বোস।

রমাপ্রসাদ বললে, কিন্তু ডাক্তার ?

—রোগ করেছ তুমি ? সারাতে হলে তুমিই সারাবে।

—আমি ? রমাপ্রসাদ ভীষণ অবাক হয়।

—তুমি নয়ত আবার কে ? এখন ভোগ করতে হবে আমাকে।

—কী বলছ ! আমি তো কোন অন্যায় করেছি বলে—।

—নিশ্চয় করেছ। একশ বার অন্যায় করেছ। কাজল হাসতে থাকে।

—তুমি হাসছ ?

—হাসব না তো কি কাঁদব ? যিনি পেটে এসেছেন, তার জন্যে কি এখন থেকেই কাঁদতে বল ?

খিল খিল করে হেসে ওঠে কাজল।

রমাপ্রসাদ একটু সময় চুপ করে থেকে বুঝতে পারে। গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে থাকে।

কাজল ওকে নাড়া দেয়।

রমাপ্রসাদের মুখখানা কালো হয়ে গেছে।

—তোমার কি হল আবার ?

রমাপ্রসাদ ম্লান হাসে : কী আবার হবে ? কিছু হয়নি তো।

কাজল ওর কোলের ওপর শুয়ে পড়ে। রমাপ্রসাদ কথা বলে না।

—আচ্ছা, কী হবে বল ত ? ছেলে, না মেয়ে ?

রমাপ্রসাদ অন্যদিকে মুখ ঘোরায়।

—বল না ? আমি বলছি ছেলে হবে।

—কী করে জানলে ? ঠাকুর যা দেবেন তাই তো হবে।

কাজল বলে, দেখো, আগে থেকে বলে রাখি, ছেলে হলে কিন্তু তাকে ওই কণ্ঠি তেলক-টেলক পরিয়ে সঙ সাজাতে পারবে না।

রমাপ্রসাদ হাসে। কিন্তু বড় বিষণ্ণ হাসি।

—ওকে আমার মত করে মানুষ করে তুলব।

রমাপ্রসাদ হাসে : তোমার অনেক আশা।

—আহা, এমন আশা কোন মেয়ে না করে।

—তা বটে। কিন্তু—।

—কিন্তু কি ?

—আশা করলে ঠকতে হতেও পারে।

—ঠকবই যে এমন কথা জোর করে বলতে পার না।

—তা ঠিক।

চুপ করে বসে থাকে রমাপ্রসাদ। চিন্তার বিষণ্ণতা ওকে যত ম্লান করে দিতে চায়, ও ততই ওর ঠাকুরকে স্মরণ করে মনে মনে।

কাজল চিন্তার আর কল্পনার রঙে প্রজাপতির মত চঞ্চল হয়ে একবার পা নাচায়, এক একবার দুলে দুলে ওঠে রমাপ্রসাদের কোলে।

এতদিনে রমাপ্রসাদকে ও সত্যিই জব্দ করতে পেরেছে। আর ভয় নেই ওর। সন্তানকে নিয়ে এবার স্বপ্ন দেখুক। ওর ঠাকুরের স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাক সন্তানের স্বপ্নে। ঠাকুর ওর প্রতিষ্ঠিত হোক সন্তানের ভেতর। ছোট ছোট দুখানা হাত, ছোট ছোট কালো দুটো চোখের পাশে ফোলা ফোলা দুটো গাল। দাঁত নেই তবু ফিক ফিক হাসি। খুব জব্দ এবার।

—নিজেকে আবার ভাগ করে দিলাম! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল রমাপ্রসাদ।

কাজল ওর দিকে তাকায়ঃ তার মানে?

রমাপ্রসাদ হাসেঃ আমিই তো ভাগ করলাম নিজেকে। তোমার পেটে ওতো আমারই সত্তা।

কাজল হেসে ওঠেঃ কী যে বাজে বকো!

—তা বটে।

রমাপ্রসাদ আর কথা বাড়ায় না। তেমনি চুপ করেই বসে থাকে।

দিন কতকের ভেতর বাড়ির সকলেই জানতে পারে। প্রথমেই জানতে পারে বড় জা।

—ওমা তাই নাকি?

কাজল রাঙা হয়ে মুখ নীচু করে।

বড় জা হেসে গড়িয়ে পড়েঃ ওমা গো! ঠাকুরপোর পেটে পেটে এত!

কাজল যেন আরও লজ্জা পায়। লজ্জা পেতে ভাল লাগে। আনন্দ লাগে।

—বলব ঠাকুরপোকে, তোমার ঠাকুরের নামের জোর আছে বাপু।

কাজল ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে। খেতে পারে না।

—তোমার দাদাকে বলব। খাবার-দাবার আনাতে হবে। যা খেতে ইচ্ছে হবে বলবে কিন্তু ভাই।

কাজল বলে, কিছু খেতে ইচ্ছে হয় না।

—তা বললে তো চলবে না। আচ্ছা, আমি সব ব্যবস্থা করছি কাল থেকে।

ত্রুটি কিছু হয় নি। বড় জা পরদিন থেকে এমন আদর যত্ন শুরু করল যে কাজলের প্রাণ যায়। জোর করে এটা খাওয়ান ওটা খাওয়ান। বেড়াতে নিয়ে যাওয়া। চুল বেঁধে দেওয়া। নিজের কাছে নিয়ে দুপুরে শোয়া। কোন ত্রুটি নেই কোনদিকে। আনন্দে আরামে কাজল দেখতে বেশ ভারী হয়ে উঠছে। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। লজ্জায় স্নিগ্ধতায় কাজল যেন সত্যি একটি রূপবতী মেয়ে হয়ে উঠেছে।

রমাপ্রসাদ দেখেও দেখে না। মাঝে মাঝে অভিমান হয় কাজলের। মাধুর্যে ভরে উঠেছে ওর সর্বাঙ্গ। দেহখানি ভারী লাগে। নিজেরই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় নিজের দিকে। কিন্তু রমা-প্রসাদ তাকায় না। মনটা মাঝে মাঝে বড় খারাপ হয়ে যায়। একদিনও রমাপ্রসাদ বলল না, কি সুন্দর দেখতে হয়েছ তুমি! একটুও আদর করল না। বরং আরও যেন বেশী তফাতে থাকতে চায়। আগের চেয়ে বেশী সময় থাকে ঠাকুর ঘরে। রাত্রে এত দেরি করে আসে যে কাজল জেগে থাকতে পারে না। ঘুমও আজকাল যেন অনেক বেড়ে গেছে। বড্ড ঘুম পায়।

ভোরে উঠে দেখে অনেক আগেই রমাপ্রসাদ উঠে চলে গেছে গঙ্গাস্নান করতে। দেখে অভিমানে বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। তবু মুখে কিছু বলে না। বলবার অবসরও পায় না। নীরবে অপেক্ষা করে। ছেলে হোক, তারপর সে-ও দেখে নেবে।

শেষ পর্যন্ত মেয়ে হল কাজলের। রমাপ্রসাদ তখন আরতি করছিল। খবরটা দিতে গেলেন বৌঠান।

—ও ঠাকুরপো!

রমাপ্রসাদ একমনে আরতি করে চলেছে।

—ঠাকুরপো! ধুত্তোর! ও ঠাকুরপো!

রমাপ্রসাদ একবার তাকায় শুধু। চোখ দুটো ওর জবাফুলের মত লাল।

—তোমার মেয়ে হয়েছে। পুজো সেরে নীচের ঘরে এস।

রমাপ্রসাদ কথা বলে না। বৌঠান চলে যান। খবরটা দিয়ে তিনি কিছু আনন্দ প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বৃথা আশা। রমাপ্রসাদের সাড়াই মেলে না।

ঠাকুর পুজো সেরে যখন রমাপ্রসাদ ঠাকুরঘর থেকে নামে রাত তখন কম নয়। সেদিন আতুড় ঘরের দিকে আর সে যায় না। পরদিনও যায় না। বললে, বলে, পরে দেখব'খন। অত তাড়া কেন?

বৌঠান বিমর্ষ হন। ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু ও তবু নির্বিকার।

মেয়ে যখন দু-মাসের, তখন একদিন রাত্রে রমাপ্রসাদ কাজলের শোবার ঘরে যায়। কাজল এখন ওর বড় জায়ের সঙ্গে আলাদা ঘরে শোয়। মেয়ে একটু বড়সড় না হলে নিজের ঘরে যাবে না। এই-ই রীতি।

রমাপ্রসাদ ঘরে গেল। মেয়েকে পাশে নিয়ে কাজল শুয়ে ছিল। বৌঠান ঘরে ছিল না।

ও ঘরে ঢুকতেই কাজল তাকায়। কোন কথা বলে না।

—কেমন আছ? রমাপ্রসাদ হাসে।

ফুটফুটে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রমাপ্রসাদ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর আর একটা কথাও বলে না। গম্ভীর হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কাজল অবাক হয়। একটু শঙ্কিতও হয় আজ। রমাপ্রসাদের

মুখে ও এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। মেয়ে পেটে আসবার পর থেকেই এ পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, সেটা যেন আরও সুদৃঢ় সুস্পষ্ট মনে হচ্ছে। ও একটা কথাওতো বলতে পারত! কেনই বা বলবে? দেড়মাসের ভেতর যে একদিন দেখতে আসবার সময় পেল না, তার সঙ্গে কথা বলা কি উচিত? কোন স্ত্রী কি কথা বলত? তার কি রাগ হতে নেই, অভিমান হতে নেই? কাজল মুখখানা কালো করে মেয়েকে আরও কাছে টেনে নেয়। এই সন্তান তার মনে যে শক্তি দিয়েছে, তাতে সে রমাপ্রসাদকে আর অত গ্রাহ্য করে না।

আরও দেড়মাস কাটে। রমাপ্রসাদ আর একদিনও আসে না। এতদিনে কাজল তার নিজের ঘরে যাবে। একবার ভাবে বড় জাকে বলবে না কি যে সে আর ওঘরে যাবে না। আবার ভাবে থাক। গেলেই বা ক্ষতি কি? অভিমানের একটা কিনারা হতে পারে। এই স্তব্ধতার বোঝাটা ক্রমশই ভারী হয়ে উঠছে। রমাপ্রসাদকে কাছে পেলে বোঝাপড়ায় রাগটা হালকা হতে পারে হয়তো।

নিজের ঘরে গেল কাজল। প্রথম রাত্রি অপেক্ষা করে রইল রমাপ্রসাদের জন্যে। ও এল অনেক রাত্রে। তখন ঘুমে চোখ টেনে রাখতে পারছে না কাজল। তা-ছাড়া এতরাত্রে আর কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। কোন কথাই হল না সে রাত্রে। রমাপ্রসাদ শুয়ে পড়ল খাটে। কাজল মেয়েকে নিয়ে শুয়ে ঘুমোল মেঝেতে।

দু রাত্রি গেল। তিন রাত্রি গেল। চতুর্থ রাত্রি আসবার সময়ের অনেক আগেই ঘরে ঢুকল রমাপ্রসাদ। কাজল বসে ছিল মেয়েকে কোলে নিয়ে।

রমাপ্রসাদ ওদের বিছানার ওপর এসে বসল।

কাজল কোন কথা বলল না।

—খুব রাগ করেছ আমার ওপর, নয়?

কাজলের বুকের ভেতরটা আবেগে ভরে উঠেছে। এতদিনে ওর এটুকু সংবিৎ ফিরে এল।

—কতকগুলো কাজে ব্যস্ত ছিলুম, রাগ কোর না।

ওর গায়ে হাত দিল রমাপ্রসাদ। কাজলের চোখে জল আসে-আসে।

একতাড়া কাগজ কাজলের সামনে রাখে ও।

কাজল তাকায়। কাগজগুলো কিসের ?

রমাপ্রসাদ ওর দিকে তাকিয়ে সহজ মাধুর্য নিয়ে হাসে আজ: তোমাকে আগে বলা হয় নি। দাদাকে বলে সব সম্পত্তি ভাগ করে নিয়েছি। সেইজন্যেই তো তোমার কাছে আসবার সময় করে উঠতে পারি নি।

কাজল মনে মনে খুশীই হয়। বলে, হঠাৎ ভাগ করতে গেলে কেন ?

—তোমার নামে আমার ভাগটা সব লিখে দিলুম।

—কেন ? কাজল ভীষণ অবাক হয়।

—তোমাকে স্ত্রী বলে যখন গ্রহণ করেছি আর সন্তান যখন হয়েছে, তখন তোমাদের খাবার যোগাড় করে রাখা আমার কর্তব্য। তা এ সম্পত্তিতে তোমাদের দুজনের জীবন কেটে যাবে।

—তার মানে ?—আশঙ্কায় কাজলের গলা কাঁপে।

মেয়েটা রমাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল।

রমাপ্রসাদ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললে, দেখ দেখ কি মায়া ওর চোখে। ওর নাম রাখলাম যোগমায়া। শুধু মায়া বলেই ডেকো।

কাজল চমকে ওঠে ওর কথায়।

—ও বাঁধতে চাইছে আমায়। তাই আর দেরি করতে চাই নে। আমি কালই চলে যাচ্ছি।

হতাশ কণ্ঠে কাজল বলে, কোথায় ?

—বৃন্দাবনে।

কাজলের বুকটা ধড়াস করে ওঠে। নিজের ভাব চেপে কোনমতে বলে, তা বেশ তো বেড়িয়ে এস।

রমাপ্রসাদ ধীরে ধীরে বলে, আমি আর আসব না কাজল।

কাজলের বুকের ভেতরটা কাঁপছে। চোখ ফেটে জল আসছে।

—দেখ। তোমাকে সঙ্গে নিয়েই হয়তো যেতে পারতাম। কিন্তু তোমার ভেতরে কতকগুলো গভীর কামনা রয়েছে। এটা কাটতে সময় নেবে। ততদিন আমি অপেক্ষা করতে পারব না কাজল। প্রতি মুহূর্তে আমি হাঁপিয়ে উঠছি। কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছি নে।

আমার ঠিকানা রেখে যাব। তুমি যদি কখনও সব ছেড়ে সব ফেলে আমার কাছে যেতে চাও, তখন যেয়ো। তোমার সময় এখনও হয় নি। ঠাকুর করুন এ জন্মেই তোমার স্বপ্ন ভেঙে যাক।

কাজল তাকায় রমাপ্রসাদের দিকে। জ্বলতে থাকে ও অভিমানে, অপমানে, বিক্ষোভে। আগুন ছড়িয়ে পড়ে ওর সর্বাঙ্গে। এবারেও হেরে গেল কাজল। বার বার হেরে যাবার নিদারুণ আক্রোশের আর আফসোসের জ্বালায় জ্বলতে থাকে কাজল।

ঘেমে উঠেছেন কাজল বসুমল্লিক। সেই আগুনে জ্বলছেন আজও। ঘুম নেই। রাতের পর রাত ঘুম নেই। আজও ঘুমোতে পারছেন না। পায়চারি করছেন ঘরের ভেতর। মায়া ঘুমোচ্ছে। সুব্রত যে জ্বালা ওকে দিয়ে গেছে, সে জ্বালার জ্বলনে ওরও হয়তো ঘুম আর থাকবে না।

জ্বলতে তিনি দেবেন না মায়াকে। তিন মাসের মায়াকে বুকে করে সেদিন একা অসহায় হয়ে পড়েছিলেন কাজল বসুমল্লিক। জ্বলে উঠেছিলেন সমস্ত সংসারটার ওপর। কারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন নি। বাপের বাড়ি নয়, শ্বশুর বাড়ি নয়, কারও সঙ্গে নয়।

দৃষ্টি বেঁকে গিয়েছিল সকলের ওপর। নিদারুণ অভিমানে

সকলের ওপর এসেছিল এক অহেতুক আক্রোশ। বেরিয়ে পড়লেন শ্বশুরবাড়ি থেকে নিজের সম্পত্তি বুঝে নিয়ে। ভর্তি হলেন আবার কলেজে।

বড় জা একবার বললেন, এখানে থাকলেই পারতে।

গম্ভীর দৃঢ় স্বরে বললে কাজল, না দিদি, কারও সঙ্গ আর ভাল লাগছে না। কিছু মনে কোর না। আমি আলাদা থাকতে চাই। নিজের পথ আমাকে একাই ঠিক করে নিতে হবে।

বড় জা আর কিছু বললেন না। বিষণ্ণ মুখে চলে গেলেন।

ভাসুর ওর পাওনা টাকা সব বুঝিয়ে দিলেন। কাজল বুঝে নিল ওর বছরে কত আয়।

ছোট একটি বাড়ি ভাড়া করে উঠে চলে গেল।

চাকর রাখল, আয়া রাখল। নিজে ভর্তি হল কলেজে। এম, এ, পর্যন্ত পড়তে হল। পাস করল পর পর।

কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। তাতেও জ্বালা কমে না।

আরও কাজ চাই। প্রচুর কাজ। নিরবচ্ছিন্ন কাজ। সব ভুলে যেতে চান কাজল। বিগত দিনের সব কিছু।

এক বান্ধবী ওকে নিয়ে গেল পার্টিতে। পার্টির কাজে মনোনিবেশ করলেন কাজল।

বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে পার্টিকে অনেক বড় করে তুললেন। ক্রমে নেতৃস্থানীয়া হয়ে বসলেন। টাকায়, বিদ্যায়, কাজে আর রূপের ব্যক্তিত্বে তাঁর যশ নাম আর প্রতিষ্ঠা আসতে দেরি হল না। পথ খুঁজে পেলেন কাজল বসুমল্লিক।

সব ভুলে যেতে লাগলেন ধীরে ধীরে। বাইরে পার্টি, বাড়িতে মায়া। এর বাইরে কোন চিন্তা নেই, কোন ভাবনা নেই। ছড়ান মনকে গুটিয়ে আনলেন ধীরে ধীরে। পার্টি আর মায়া জুড়ে রইল সমস্ত মন। পার্টিতে তবু যদি বা স্বার্থ ছিল। পরোপকারের ব্রতের পর্দার তলায় ছিল যশ মান আর অহঙ্কারের থলি। অতি গোপনে ঢাকা থাকত সে ভাবগুলো। বাইরের মানুষ ভাবত এমন নিঃস্বার্থ

দেশপ্রেমিকা দেখা যায় না। মানুষের জন্যে তার প্রাণ কাঁদে। গরীবের জন্যে প্রাণ কাঁদে।

কাঁদে কী? সত্যিই কী কাঁদে? তার পেছনে কি কোন ব্যক্তিগত অহঙ্কারের স্পর্শ নেই?

নিজেকে বিচার করতে চান না কাজল বসুমল্লিক।

বিশ্লেষণ করলে হয়তো অনেক অপ্রিয় সত্য চোখের সামনে ভেসে উঠতে পারে। থাক, যা চাপা আছে, তা চাপাই থাক। নিজের ভেতরটায় উঁকি দিতে ভয় করে, ভালও লাগে না।

এই-তো বেশ। সামনের লোকসভার নির্বাচনে দাঁড়াবেন। সেই চিন্তাটাই এখন সবচেয়ে বড় চিন্তা। তার ওপর আরেক ভাবনা মায়াকে নিয়ে।

মায়াকে বাঁচাতে হবে। আগুন-জ্বালা পুরুষ সুব্রত। ছেলে-টাকে পার্টিতে নেওয়াই অন্যায় হয়েছিল তাঁর। সামনের মিটিংয়ে ওর নামে কয়েকটা গুরুতর অভিযোগ আনতে হবে। তাড়াতে হবে ওকে পার্টি থেকে। অমন রোমান্টিক ছেলেকে দিয়ে রাজনীতি চলবে না।

এ ক-দিন মায়াকে একেবারে আটকে রাখবার ব্যবস্থা করতেই হবে। সুব্রতর সঙ্গে যাতে আর কোনমতে দেখা করতে না পারে। প্রেমের রঙ মুছে ফেলতে হবে মায়ার চোখ থেকে।

তারপর মায়ার বিয়ে তিনি দেবেন। সমীরের মত একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। যাকে উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে, সর্বস্ব বিকিয়ে দেবে মায়ার পায়ের কাছে। চিরদিন ভিখিরী হয়ে থাকবে মায়ার কাছে। এই রকম একটি ছেলে পেলে মায়া সুখী হবে। নির্বিঘ্নে কাটাতে পারবে জীবনটা। নিশ্চিন্তে।

এমন একটি ছেলে চাই যার চোখে অজয়ের মত নেশা নেই, রমাপ্রসাদের মত নির্লিপ্ততা নেই। যে পুরুষ শুধু মাত্র একটি মেয়ের কাছে সব কিছু বিকিয়ে দিয়ে চিরকাল কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকবে।

এই কি আদর্শ পুরুষ!

আদর্শ কথাটা একেবারে বাজে। ভুয়ো কথা। আদর্শ ছেলে চাই না। একটি নিরীহ নম্র ছেলে চাই, যে মায়ার মত একটি মেয়ের জন্য লালায়িত।

সুব্রত সে জাতের ছেলে নয়। সুব্রতকে নিষ্ঠুরভাবে সরিয়ে দিতে হবে মায়ার কাছ থেকে। চিরদিনের মত মায়ার চোখের সামনে থেকে দূর করে দিতে হবে।

তারপর দুদিনের রঙীন আলাপ ভুলতে মায়ার বেশী দেরি হবে না।

নিশ্চয়ই সুব্রতকে ভুলতে পারবে। ভোলাতে হবে।

পরদিন সকালে উঠে জলখাবার চা খেয়ে পার্টির কাজে বেরোবার আগে টেবিলে চা রেখে মায়াকে ডেকে পাঠান কাজল বসুমল্লিক।

মায়া ভোরে উঠে নিজের পড়বার ঘরে চলে গেছে। এধারে আর আসে নি এতক্ষণ। মায়ের ডাক শুনে ঘরে এসে ঢোকে।

—বোস।

মায়া মুখ নীচু করে নীরবে।

চা ঢালতে ঢালতে কাজল একবার তাকান মায়ার মুখের দিকে।

—একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি।

মায়া মুখ তুলে তাকায়। নিরুত্তরে।

—আজ থেকে তোমার পার্টি-অপিসে যাবার দরকার নেই।

এ আদেশ। অনুরোধ নয়। মায়া বেশ বুঝতে পারে এ আদেশের মানে।

—পড়া তোমার চলবে। সমীর রোজ সন্ধ্যেবেলা এসে পড়িয়ে যাবে।

মায়া একবার কেঁপে ওঠে। কথাটার মানে অতি পরিষ্কার। পার্টিতে গেলে যদি সুব্রতর সঙ্গে আবার দেখা হয়, এই আশঙ্কাতেই মায়ের এই আদেশ।

—বিকেলে আমার সঙ্গেই বেড়াতে বেরোবে। আমিও আজ থেকে একটু বিকেলে বেড়াতে বেরোব ভাবছি।

তার মানে বিকেলেও একা একা বেড়াতে যেতে দেবেন না।

মায়া তাকায় মায়ের দিকে। অত্যাচারের এত সূক্ষ্ম বোধ মায়ের! চোখে তাপ নিয়ে তাকায় মায়া।

—বিকেলে আমি বেড়াতে যাব না।

কাজল চায়ে চুমুক দিয়ে তাকান মায়ার দিকে। এ ধরনের অস্বীকারের কথা মায়ার মুখে এই প্রথম।

বলেন, বেশ। না গেলে।

চা খেয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে বলেন কাজল, আর একটা কথা ভাবছিলাম।

আবার কি আদেশ? মায়া তাকায়।

—আমি তো কয়েকমাস পরে ইলেকশন টুরে যাব।

—জানি।

—তা ভাবছিলাম, তুমি কি একা একা এ বাড়িতে থাকতে পরবে?

মায়া নিরুত্তব।

—তাই তোমাকে বোর্ডিংয়ে রাখব বলে ভাবছিলাম।

মায়ার বুক কেঁপে ওঠে। একেবারে জেলে পোরবার ব্যবস্থা।

—দেখি একটা ভাল বোর্ডিং পাই কিনা!

বলতে বলতে কাজল বসুমল্লিক বেরিয়ে যান।

মায়া কিছুক্ষণ বসে থেকে পড়বার ঘরে চলে যায়? বইখানা অভ্যাসবশে মুখের কাছে তোলে। কিন্তু এক লাইনও পড়তে পারে না। চোখদুটো বার বার ঝাপসা হয়ে আসে। বার বার চোখ মুছতে হয়।

একদিন যায়। দুদিন যায়। দুদিনেই সমস্ত সংসারটা মায়ার কাছে বিস্বাদ হয়ে ওঠে। কলেজে যাওয়া। কলেজ থেকে এসে চুপ করে বসে থাকা। সন্ধ্যায় সমীর আসে। অনবরত বকর বকর

করে। মায়া কিছুতেই কিছু বোঝে না। ভাগ্যিস সমীর পড়া ধরে না। নিজে খুব খানিকটা বকে খুশী হয়ে চলে যায়।

কিছুতেই কিছু ভাল লাগে না মায়ার। ওর যেন দম নিতে কষ্ট হয় আজকাল। ওকে যেন চেপে ধরে রয়েছেন কাজল বসুমল্লিক। হাঁপিয়ে উঠছে ও।

তিনদিন গেল। চারদিন গেল। অসহ্য হয়ে উঠছে আবার। ও স্পষ্ট বুঝতে পারে মায়ের দৃষ্টিটা যেন আরও প্রখর হয়ে উঠেছে। কথা প্রায় বলেনই না। শুধু তাকান বার বার। সে দৃষ্টি যেন মায়ার সর্বাঙ্গে সুচের মত বেঁধে। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

মা কি ওকে এমনি করে মেরে ফেলবে শেষ পর্যন্ত!

সেদিন সমস্ত রাত চোখ বুজে ভাবে মায়া। সুব্রতর কাছে তাকে যেতেই হবে। যেমন করে হোক। সুব্রত ছাড়া তাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। নইলে সে নিশ্চয়ই মরে যাবে। নিশ্চয়। মৃত্যুর আগে বাঁচবার শেষ চেষ্টা তাকে করতেই হবে।

ও স্পষ্টই বুঝতে পারছে যে সুব্রতকে ওর জীবনে একান্ত প্রয়োজন। সুব্রতকেই ওর একান্ত আপন বলে মনে হয়। কিন্তু কি করে দেখা করা যায়। সুব্রত যে ওকে তার বাড়ি যেতে বলেছিল একবার, তখন ঠিকানা দিয়েছিল। ঠিকানাটা সযত্নে রেখেছে সে তার হাত-থলির ভেতর।

ও সুব্রতর বাড়িই যাবে। কালই যাবে।

পরদিন একটু সকাল সকাল কলেজে বেরোয়। বেরিয়ে সোজা সুব্রতর বাড়ি। রাস্তাটা চিনতে কষ্ট হয় নি কিছু। গলিটাতে ঢুকে বাড়ির নম্বরটা মেলাতে যা দেরি হয়েছে। তবু বার বার ও পেছনে তাকিয়েছে। কেবলি ওর মনে হয়েছে মায়ের ছায়া আসছে ওর পেছন পেছন। আতঙ্কে ঘেমে উঠেছে মায়া। নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। কপালের খুচরো চুল ভিজে উঠেছে ঘামে।

আস্তে আস্তে বাড়ির দরজার কড়া নাড়ল মায়া।

দরজা খুলল।

সামনেই সুব্রত নাগ। অতি সহজ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সটান দাঁড়িয়ে আছে।

মায়া চোখদুটো নামায়। ভয়ে লজ্জায়।

—এস।

আস্তে আস্তে ভেতরে ঢোকে মায়া।

দোরটা খোলা রেখেই সুব্রত এগোয়।

—দোরটা বন্ধ কর।

সুব্রত হাসে, কেন, তোমার মা কি পেছন পেছন আসছেন? আসুন। ভালই হবে।

মায়া তবু ভয়ে ভয়ে তাকায়।

সুব্রত গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসে। ওকে সঙ্গে নিয়ে যায় ভেতরে ওদের শোবার ঘরে। চৌকির ওপর নিজে বসে পড়ে।

—বোস। আমি জানতাম তুমি আসবে।

ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে মায়ার। বলে, এক গেলাস জল খাওয়াবে?

সুব্রত নিজেই জল গড়িয়ে দেয়। ঢক ঢক করে পুরো গেলাস জল খেয়ে মায়া বলে, আমি এসেছি। মানে—।

—কোন মানে নেই। একেবারে অর্থহীন ভাবেই না হয় এসেছ। তাতে কি? বেশ করেছ।

মায়া তবু কি একটা বলতে চায়।

সুব্রত বলে, পার্টি-অপিসে যখন তোমাকে পর পর ক-দিন দেখতে পেলাম না। তখনই সব বুঝেছি। কিছু বলতে হবে না আর। ভয় নেই।

ভয় নেই কথাটা শুনে মায়া যেন সোজা হয়ে বসতে পারে। এই একটি মাত্র কথা সে এই একটিমাত্র মানুষের কাছ থেকে শুনতে পায়। সুব্রতর কাছে এলে ও যেন মন্ত্রের মত জোর পায় মনে। ভয় কমে যায় ক্রমে।

—তোমার ছোট ভাই কোথায়?

—বেরিয়েছে।

—তুমি ভাগ্যিস বেরোও নি!

হাসল সুব্রত। কোন কথা বলল না।

এত কথা ভিড় করে আসছে মনে। একটার পর একটা। অনেক কথা। অনেক আবেগ। আবেগে কথায় জমাট বেঁধে পাক খায় মনের আনাচে কানাচে। মুখে একটা কথাও বেরোতে চায় না।

মুখটা নীচু করে অনেক চেষ্টায় বলে মায়া, বাড়ি থেকে বেরোন বন্ধ আমার।

সুব্রত তবুও হাসে: তালা দিয়ে রাখে নি তো?

—তার চেয়েও বেশী। বোর্ডিংয়ে রাখবে বলেছে।

—বেশ তো! থাক না।

—একেবারে বেরোতে না দেয় যদি?

—না-ই বা দিল।

—বারে, তুমি বেশ তো! একা একা থাকব কি করে?

—তুমি তো একাই, দুজন কি আমাকে নিয়ে?

বিরক্ত হয় মায়া। লজ্জায় রাগ হয়। সব বুঝেও যে বুঝতে চায় না, তাকে আর বোঝাবে কি করে।

সুব্রত বলে, তাতেই বা ভয় কি। বোর্ডিংএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বান্ধবী করে তুলতে আমার তিনদিনের বেশী লাগবে না। ওতে তোমার মা খুব সুবিধে করতে পারবেন না।

মায়া যে কী ভরসা পায় সুব্রতর কাছে এলে সুব্রতর কথা শুনলে তা বোঝান যায় না। ও সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

মায়ের ব্যক্তিত্বকে গ্রাহ্য করে না, মায়ের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে হেসে উড়িয়ে দেয়, এমনি এক ছেলে সুব্রত। মায়ের ভয়কে অতিক্রম করতে হলে সুব্রতকে ওর সেতু বানাতে হবে।

এ-কদিনের সব আতঙ্ক ওর মুহূর্তে উড়ে যায়।

সুব্রতর কথা শুনে ও সহজভাবে হেসে ওঠেঃ আমি কিন্তু ওখানে আর একেবারে থাকতে পাচ্ছি নে।

সুব্রত তাকায়।

বলতে বলতে মায়ার গলা করুণ হয়ে ওঠেঃ দিন রাত যদি বুকের ওপর পাঁচমণ একখানা পাথর চাপিয়ে রেখে দেয়, তা হলে কি অবস্থা হয় বল তো? এক মুহূর্ত আর থাকতে ইচ্ছে হয় না আমার। মাঝে মাঝে মনে হয় তার চেয়ে বরং—

তার চেয়ে বরং যে কী সেটা আর বলতে পারে না মায়া।

—মরে যাই? পাদপুরন করে সুব্রত ম্লান মুখে হাসতে হাসতে।

মায়া ওর বড় বড় কালো চোখ দুটো তুলে তাকায়, আস্তে আস্তে বলে, তোমাকে ফেলে মরতে ইচ্ছে হয় না।

—কিন্তু আমাকে নিয়েই বা যাবে কি করে? আমি তো মরতে রাজী নই।

—শুধু কি তাই আমি মরে গেলে তো অন্য এক মেয়ে তোমার কাছে আসবে।

—সুব্রত ওর ছেলেমানুষের মত কথা শুনে হেসে ওঠেঃ তুমি কি আমাকে তোমার সম্পত্তি করে রাখতে চাও? কবে থেকে এ অধিকার পেলে?

মায়া একটুও হাসে না, বলে, যেদিন থেকে প্রথম তোমায় দেখি।

—তোমার চোখে বড় কড়া রঙ মায়া।

—যা বলছি, একথা সবচেয়ে সত্যি।

—আমি কি মিথ্যে বলেছি? আমি বলছি সত্যকে রঙিন করে তোলা ভাল নয়।

মায়া ওর কাছে ধমক খেয়ে বিষণ্ণ হয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নিজে যেচে এসে সুব্রতর কাছে নিজেকে যেন অনেক ছোট মনে হয়। কেন সে এত ছোট হতে গেল? না এলেই হত। সুব্রতর

মনোভাব তো তার মত এত গভীর নয়। সে কি তাকে এত সহজে গ্রহণ করতে রাজী হবে?

যেমন ছিল তেমনি থাকলেই হত। হোক যন্ত্রনা, হোক কষ্ট তবু সুব্রতর কাছে আর না আসাই ভাল।

—আজ উঠি।

সুব্রত গম্ভীর মুখে বলে, বোস।

—না, উঠি।

—না, বোস। এখন বাড়ি গেলে কলেজ তাড়াতাড়ি কেন ছুটি হল, তার কৈফিয়ত দিতে হবে।

—তা হোক।

সুব্রত উঠে মায়ার হাত ধরে ওকে বসায়।

—শোন। আমাকে একটু ভাববার সময় দাও।

মায়া অতি করুণ মুখে হাসে: ভাববার আর কি আছে?

সুব্রত বলে, আমাকে মাস দুয়েক সময় দাও।

—কিসের সময়?

—তোমাকে হরণ করে আনবার। হেসে ওঠে সুব্রত।

মায়া একটু হাসে এতক্ষণে।

—একটু বোস। আমি স্নান খাওয়া সেরে নিই।

—তারপর?

—তারপর কলেজ পালাব আমিও। চল দুজনে কোথাও যাই।

—কোথায়?

—জাহান্নমে। হেসে ওঠে আবার সুব্রত।

মায়া চুপ করে বসে থাকে।

—আমার সঙ্গে জাহান্নমে যেতে রাজী তো?

মায়ার মুখখানা কালো হয়ে ওঠে: তুমি তামাশা করলে আমার সব চেয়ে বেশী কষ্ট হয়।

সুব্রত ওর-দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর আস্তে আস্তে বলে, আমার অন্যায় হয়েছে। তবে

কথাটা খুব যে মিথ্যে তা নয়। আমাদের যে কোথায় যেতে হবে শেষ পর্যন্ত বলতে পার তুমি ?

—পারি।

—কোথায় বল ?

গম্ভীরভাবে বলে মায়া, শ্মশানে।

চমকে ওঠে সুব্রত : কি বলছ !

—যা সত্যি তাই বললাম। তাহলেই বুঝতে পারছো সত্যকে আমি রঙিন করে তুলি না।

সুব্রত মাথা নীচু করে : হার মানলুম তোমার কাছে।

মায়া আবার বলে, আজ উঠি। কলেজে কয়েকটা ক্লাস করে বাড়ি যাব।

—কলেজ তো এখানেই হচ্ছে। তোমার মা তো জানছেন তুমি কলেজে।

মায়া হাসে : তা বটে। কিন্তু কলেজে একেবারে না গেলে কলেজে তো মা খোঁজ নিতেও পারেন। কয়েকটা ক্লাস করিগে তার চেয়ে।

—আবার কবে আসছ ?

—দেখি।

—পরশু শনিবারে এস।

—আসব।

মায়া এবার ওঠে। সুব্রত দোর খোলবার জন্যে ওর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসে। দোরটা খোলবার আগে আর একবার বলে, ভয় নেই। তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারি নে এমন কথা ভেব না।

মায়া তাকায়। সুব্রতর এই কথাটা শুনে চোখ দুটো ওর ভিজে উঠতে চায়।

অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে শুধু বলে, এই কথাটা স্পষ্টই বুঝেছি, তুমি ছাড়া আমার বাঁচবার আর উপায় নেই।

সুব্রত ওর বলিষ্ঠ হাতে মায়ার হাত দুটো চেপে ধরে শুধু।

এই ওর উত্তর।

দোর খুলে দেয় সুব্রত। মায়া বেরিয়ে যায়।

দিনের পর দিন কাটছে। কাজল বসুমল্লিক লক্ষ্য করছেন মায়া দিন দিন অসম্ভব গম্ভীর হয়ে উঠছে। মনে মনে হাসেন, ভাবেন হয়ত একটু রেগেছে। একটু কষ্ট পাচ্ছে সুব্রতর অভাবে। তা পাক। এই কষ্ট থেকেই হয়তো জীবনের গভীরতা টের পাবে। কিছুকাল পরে বুঝবে সুব্রত ওর সর্বনাশ করতেই চেয়েছিল। একটু সময় নেবে বুঝতে। হয়তো বুঝবেও।

কাজল আত্মতৃপ্তিতে ভরে ওঠেন। মায়ার সঙ্গে নেহাত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেন না।

সেদিন সন্ধ্যার পর এসে দেখেন মায়া ওর পড়বার ঘরে চুপ করে বসে আছে। মুখ অসম্ভব গম্ভীর। সামনে বই খোলা নেই। এমনিই চুপ করে বসে আছে।

কাজল বসুমল্লিক ঘরে ঢোকেন।

মায়া তাকায় কিন্তু চমকায় না।

—সমীর এসেছিল আজ ?

মায়া উত্তর দেয় না।

কাজল আবার বলেন, সমীর এসেছিল আজ ?

মায়া মায়ের দিকে চোখ তুলে বলে, না। কাল থেকে আসতে বারণ করে দিয়েছি।

স্তম্ভিত হলেন কাজল বসুমল্লিক। ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে।

—কেন বারণ করলে ?

মায়ার ভ্রূ-দুটোও কুঁচকে ওঠে।

—কেন বারণ করলে ? কাজলের স্বর অতি গম্ভীর।

মায়া অতি তাচ্ছিল্যভরেই বলে, ভাল লাগে না তাই।

কাজল অবাক হলেন আরেকবার, তোমার কি ভাল লাগে না লাগে সেটা আমি বুঝব।

মায়া ভ্রূ-দুটো কুঁচকে মায়ের দিকে তাকায়।

উঠে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, না। তুমি বুঝবে না। সেটা আমি বুঝব।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কাজল বসুমল্লিক। তিনি কি কোথাও ভুল করে ফেলেছেন? তাঁর মুখের ওপর এমন সরাসরি জবাব দেবার স্পর্ধা মায়া কোথায় পেল? কোথাও কি কোন ভুল হল আবার?

না। তা নয়। সুব্রতর অভাবটা এতই তীব্র হয়েছে ওর কাছে যে সমস্ত রাগটা এসে পড়ছে তাঁর ওপর। এ রাগের ভাবটা হয়তো দু-চারদিন থাকবে। তারপর ঠিক হয়ে যাবে সব।

কিন্তু এত বেশী রাগ করা তো মায়ার স্বভাববিরুদ্ধ। ও চির-কাল ভয় করতে জানে, রাগ করতে তো জানে না! তেমন শিক্ষা তো ওকে তিনি দেন নি!

একটু চিন্তিত হলেন কাজল বসুমল্লিক। তবে এটা স্থির করে ফেললেন যে মায়ার সঙ্গে একটু নরম সুরেই কথা বলতে হবে। আস্তে আস্তে সইয়ে নিতে হবে।

মায়া ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যায় ছাতে। আকাশের নীচে দাঁড়ায়। আলসের কাছে গিয়ে তাকায় আকাশের দিকে। চোখের জলে ওর গাল ভেসে যাচ্ছে। বার বার চোখ মোছে।

মায়ের কথার উপযুক্ত জবাব সে দিয়েছে। রাগে অভিমানে কেঁদে ফেলেছে।

আর সে সহ্য করবে না। আর সহ্য করবার কোন প্রয়োজনও নেই।

আজ সুব্রত তো স্পষ্টই বললে, সামনের মাসের পয়লা থেকে বাইরের একটা কলেজে প্রফেসারি নিয়ে চলে যাচ্ছে।

—তোমার ছোট ভাই আর বোন?

—ওরা এখানেই থাকবে, টাকা পাঠাব।

—ওখানে কি ঘর ঠিক করেছ?

---এক বন্ধু আছে ওই কলেজে। তার বাড়িতে একখানা ঘরেই আপাতত ওঠা যাবে।

মায়া ম্লান মুখে বলেছিল, তাহলে আমি কি করব?

সুব্রত হেসে বলেছিল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

মায়া চমকে উঠেছিল ঃ আমি যাব!

---তোমার জন্যেই তো বাইরে প্রফেসারি নেওয়া।

মায়া সব লজ্জা ভুলে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল সুব্রতকে।

সুব্রত হাসতে হাসতে আরও অনেক কথা বলল।

অনেক কথা। অতি গোপন কথা। একান্ত আপন জনের কথা।

আর মায়া কেন ভয় করতে যাবে। যে শক্তি সে সুব্রতর কাছে পেয়েছে, তাতে সে এখন গোটা পৃথিবীটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনছে না।

—খুকী!

মায়া এইটেই ভেবেছিল, মা ঠিক ছাতে উঠে আসবে। মায়া ফিরেও তাকায় না।

কাজল বসুমল্লিক ধীরে ধীরে এসে ওর পিঠে হাত দেন।

—খুকী!

মায়া তাকায় না তবুও।

—ভালই করেছ। ভাল না লাগলে মিছিমিছি সমীরের আসবার কি দরকার?

মায়া নিরুত্তর।

—চল, ঘরে চল।

মায়া কথা বলে না।

—কাল আমার সঙ্গে একবার পার্টি-অপিসে যেতে পারবে কি ?

আবার কোন একটা মতলব করেছেন মা। মায়া ফিরে তাকায়।

—কেন?

—এমনি একটা কাজ ছিল। অবিশ্যি ইচ্ছে না করলে যেয়ো না।

মায়া ও কথার উত্তর না দিয়ে বলে, চল খেতে চল।

কাজলও আর কিছু বলেন না।

কাজল বসুমল্লিক মায়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আজ পার্টি-অফিসে যাবার কথা আবার। ওকে পার্টির রাজনীতির কাজে লাগাবার চেষ্টা করবেন কাজল। সব ঠিক করে রেখেছেন মনে মনে। আগামী নির্বাচনের আগে ওর ওপর প্রচুর কাজ চাপাতে হবে। যাতে ঘরে বসে অন্য কোন কথা চিন্তা করবার অবসর না পায়।

সন্ধ্যার পর থেকে শরীরটাও ভাল ছিল না। তবু মায়াকে নিয়ে যেতে হবে। অপেক্ষা করছেন কাজল বসুমল্লিক। শুয়ে আছেন খাটের ওপর কাত হয়ে।

তাছাড়া সামনের নির্বাচনে তাঁকে কলকাতার বাইরে যেতে হবে। তখন মায়াকে বোর্ডিংয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতেই হবে। বোর্ডিং জানাশুনো একটা পাওয়া গেছে। ভাল করে বলে যেতে হবে যে কোথাও যেন একা একা বেরুতে দেওয়া না হয়, আর কারুর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া না হয়। বেশ কড়া করে বলে যেতে হবে। তারপর তিনি আসবার পর মায়া যদি দুঃখ করে বলে তাকে কোথাও বেরোতে দেয় নি। তবে না হয় মায়ার সামনে বোর্ডিংয়ের ওপর খুব দোষারোপ করে দুচার কথা বললেই হবে'খন। মনে মনে হাসেন কাজল বসুমল্লিক।

কিন্তু মায়া এখনও আসছে না কেন ?

সন্ধ্যা কেটে গেল। রাত হয়ে এল।

ওঠেন কাজল। চাকরটাকে জিজ্ঞেস করেন। শোনেন, তখনও ফেরে নি মায়া।

কলেজে তো এত দেরি হবার কথা নয়। তবে সোজা পার্টি-অফিসে চলে গেল? তেমন তো কথা ছিল না। একটু চিন্তিত হলেন কাজল।

রাত আরও বাড়ে। তখন প্রায় সাড়ে দশটা। এখনও কেন মায়া আসছে না?

আস্তে আস্তে ওর পড়বার ঘরে ঢোকেন কাজল। না মায়া আসে নি। ঘর অন্ধকার।

রীতিমত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন কাজল। আশঙ্কায় রাগে অস্থির হয়ে ওঠেন। দুচার দিন নরম ব্যবহার করেই বোধহয় ভুল করেছেন তিনি। আজ রীতিমত শাসন করতে হবে। শাসনের প্রয়োজনটা বার বাব উপলব্ধি করেন। কিন্তু কি শাসন করবেন?

আলোটা জ্বালেন।

প্রয়োজন হলে না খাইয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখতে হবে।

একি! টেবিলের ওপর বই খাতা কিছু নেই! মায়ার কাপড় জামা একটাও নেই ঘরে। স্যুটকেসটাও নেই। ঘরের জিনিস তো কিছুই নেই।

এটা কী?

টেবিলের ওপর একটি খাম পড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে খামটা ছিঁড়ে ফেলেন।

চিঠি! মায়ারই হাতের লেখা।

মা, আমি জানি এ চিঠি পড়ে তুমি ভীষণ আঘাত পাবে। তবু বিশ্বাস কর, এ ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না।

কাজল বসুমল্লিকের মাথাটা ঝিম ঝিম করে। মেঝের উপর বসে পড়েন। মায়া কিছু করে বসল? এরপর কি লেখা আছে পড়বার মত সাহসও যে আর পাচ্ছেন না।

তবু পড়তে হবে এ চিঠি। পড়তেই হবে।

ভয়ে আতঙ্কে বুকের ভেতরটা কাঁপছে। এমন ভয় বোধহয় তিনি জীবনে কখনও পান নি। বুদ্ধির দম্ভ চুরমার হয়ে যাচ্ছে আজ। ব্যক্তিত্বের প্রাসাদ ভেঙে পড়ছে।

তবু এ চিঠি পড়তে হবে।

ছোটবেলা থেকে বাবার কথা বললে তুমি কোন উত্তর দিতে না। কেন, তা আজ পর্যন্তও জানি নে। বাবার কথা মনে করে কতদিন কান্না পেয়েছে। তবু ভয়ে তোমাকে কিছু বলতে সাহস পেতুম না। কতকগুলো বোবা কৌতূহল মনের চারপাশে পাক খেয়ে খেয়ে আমায় পিষে মারত। তবু ভয়ে বলতাম না তোমায়।

আজ আমার কী মনে হয় জানো। জীবনে তুমি এমন কতকগুলো আঘাত পেয়েছ, যে আঘাত আর বেদনার আক্ষেপ তোমার মনের ভেতর পাষাণের রূপ নিয়েছে। তুমি পাষাণ হয়েছ জমাট বেদনার পর বেদনায়। অকারণ নিষ্ঠুরতা তোমার স্বভাবে দানা বাঁধছিল। অন্যায়ের পর অন্যায় তুমি করেছ। সংসারের প্রতিটি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছ। এতে তোমার কিছু হাত ছিল না। এ সবই তোমার সুগভীর বোবা বেদনার বিকৃত প্রকাশ মাত্র।

ইচ্ছে করলেও তুমি কোমল হতে পারতে না। কত নিদারুণ অসহায় তুমি! তোমার জন্য আজ আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে।

এ সব কি কথা! মাথার চাঁদিটা জ্বলে যাচ্ছে। কাজল বসুমল্লিকের জীবনের বিশ্লেষণ করছে তার সন্তান।

তাই তোমার সবটুকু নিষ্ঠুরতা চেপেছিল আমারই ওপরে। ছোটবেলা থেকেই আপনা আপনি আমাকে বাড়তে দাও নি। দুঃসহ চাপে দিনের পর দিন আমি কুঁকড়ে পিষে গেছি। তুমি আনন্দ পেয়েছ। তোমার মনের পাষাণের ভারটা সম্পূর্ণ আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে আরাম খুঁজছিলে।

আমার নিজের সত্তাই আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

সুব্রত আমায় বাঁচিয়েছে। সুব্রতর সঙ্গে আজ আমি কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছি।

সরকারের খাতায় আইন অনুসারে বিয়ে আমাদের হয়ে গেছে।

আক্ষেপ কোর না। তাতে নিজেই আরও জ্বলবে।

জানি নে তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে কিনা। কিন্তু একথা নিশ্চয় বলতে পারি আমার বাবা থাকলে আজ আমায় ক্ষমা করতেন।

ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন। —মায়া।

বসে আছেন কাজল বসুমল্লিক। হাতে চিঠিখানা। সংসারের পরিহাস যে এমন নির্মম হতে পারে কে জানত? তাঁর বিচার করে গেছে তাঁরই সন্তান।

জীবনেব প্রতিটি পর্যায়ে হেরে গেলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত হেরেই গেলেন।

গাল ভিজে গেল চোখের জলে। মনের জমাট বেদনায় পাষাণ বোধহয় গলে পড়ছে আজ। উপুড় হয়ে মেঝেয় পড়ে কাঁদছেন পার্টির স্বনামধন্য নেত্রী কাজল বসুমল্লিক।

তাঁর বুকের বেদনা কি সবই ধুয়ে যাবে আজ? এত চোখের জল কোথায় ছিল এতকাল?

সময়ের বোধও নষ্ট হয়ে গেছে তাঁর। ছ ঘণ্টা কেটে গেল মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে।

রাত শেষ হয়ে এল।

কাজল বসুমল্লিকের বুকফাটা কান্নার সাক্ষী কেউ রইল না।

ধীরে ধীরে উঠলেন তিনি।

ভোরের সূর্যের মত সব অন্ধকারকে ধুয়ে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

পাশের ঘরে গিয়ে ধীরে ধীরে আলমারি খুললেন। বার করলেন ছোট বাক্সটা। তার ভেতরে তলা থেকে বার করলেন অনেক বছর আগের এক টুকরা ভাঁজ করা কাগজ।

বৃন্দাবনের ঠিকানা।

কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। লিখছেন কাজল বসুমল্লিক। লিখছেন আর হাতের তালু উলটে চোখ মুছছেন বার বার।

শ্রীচরণেষু—

এ জন্মের স্বপ্ন আমার ভেঙে গেছে। উনিশ বছর আগে বলেছিলে, যদি সব ছেড়ে তোমার কাছে যেতে চাই, তুমি সাড়া দেবে। তাই আজ এই চিঠির প্রয়োজন হল।

এই সুদীর্ঘ উনিশ বছর তোমার খুকীকে কাছে রেখেছিলাম। কাল সে আমায় ছেড়ে একটি ছেলের সঙ্গে চলে গেছে। যাবার আগে আমার শেষ বিচার করে গেছে। তার বিচারের রায় আমাকে মাথা পেতে নিতে হল। লিখে গেছে, আমার বাবা থাকলে আমায় ক্ষমা করতেন।

তুমি কি ওকে ক্ষমা করতে পারতে? যদি তাই হয়, তবে তোমার সেই ক্ষমার শক্তি আজ আমি ভিক্ষে চাইছি। তুমি ছাড়া আর আমাকে বাঁচাবার মত মানুষ সংসারে কেউ নেই।

এ জন্মের স্বপ্ন আমার ভেঙে গেছে কাল। যাদের বার বার একান্ত আপনার বলে ভেবেছিলাম, তাদের সকলের কাছেই বার বার হেরে গেছি। এ কালিমা মোছবার শক্তিও বোধহয় হারিয়ে ফেলেছি আজ। আমার এ কালিমা মুছে দাও। আমি তোমার ঠাকুরকে জানি না। তোমাকে জানি।

তোমার ঠাকুর তোমাকে আপন করে নিয়েছেন। তুমি কি আমাকে আপন করে টেনে নিতে পারবে না? একদিন তো তোমার ঠাকুরের সামনেই আমাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছিলে। আজ এ ভিক্ষেও কি পাব না তোমার কাছে? ইতি—

কাজল।

———

লেখক পরিচিতি

সামাজিক জগতে সাহিত্যিককে সাধারণের মত মনে হলেও মনোজগতে তাঁর অসাধারণত্ব থাকবেই। তাঁর মানসিক চিন্তাধারা অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিলবে না, যদিও ব্যবহারিক জীবনে তাঁকে সাধারণ সমাজে সাধারণের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়তো হবে।

সাহিত্যিকের মনের ইতিকথা যদি লেখা যেত, তবে তাঁর অসাধারণত্ব বিশেষ করে বোঝা যেত। তা যখন সম্ভব নয়, তখন তাঁর ব্যবহারিক জীবনের কথাতেই তাঁর পরিচয় পেতে হবে।

স্বভাবতই চিন্তার গভীরতা যাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট সেই স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন পাবনা জেলার স্থল গ্রামে এক বিখ্যাত জমিদার গৃহে, তাঁর মাতুলালয়ে ১৯২২ সালে। পিতৃনিবাস ছিল ফরিদপুর জেলায় আমগ্রামে। পিতার চাকুরিস্থল কলকাতায় তাঁর শৈশবের কিছু সময় কাটলেও, শৈশবে মাতুলালয়ে কেটেছে তাঁর বেশী সময়। গ্রামের নালা-বিল, গাছ-গাছালি, ক্ষেত-সড়কের সঙ্গে যেমন তাঁর শৈশব থেকে গভীর পরিচয়, তেমনি পরিচয় শহরের পীচের রাস্তা আর ইটের অট্টালিকার সঙ্গে।

কলকাতার স্কুলেই তিনি পড়াশুনা করে ১৯৩৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থায় কৈশোরে তাঁর সবচেয়ে বেশী ঝোঁক ছিল ছবি আঁকায়। অজস্র ছবি এঁকে তিনি আর্ট স্কুলে ভর্তি হবেন বলেই স্থির করেছিলেন, কিন্তু দৈব ঘটনায় তাঁকে আই, এ, পড়বার জন্যে কলেজেই ভর্তি হতে হল। ঘটনাটা আর কিছুই নয়। পরিবারের সকলেই বললে, ছবি এঁকে কি আর পয়সা হবে? তার চেয়ে বরং আই, এ, পড়াই ভাল। সেদিন আর্ট স্কুলে ভর্তি হলে আজকের সাহিত্যিক স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো শিল্পী হিসেবেই পরিচিত হতেন।

এই সময়েই তাঁর ঝোঁক এল গানের দিকে। সুমিষ্ট সুরজ্ঞানের জন্যে গানেও তিনি সামান্য সময়ে সুনাম অর্জন করলেন। কলেজের প্রতিযোগীতায় ও অন্যান্য প্রতিযোগীতায় বহু পুরস্কার লাভ করলেন। কিন্তু সুরের সাধনায় তিনি একেবারে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন না। তা যদি হোত, তাহলে তিনি আজ গায়ক হিসেবেই পরিচিত হতেন।

স্কুলে পড়বার সময় থেকেই তিনি গল্প কবিতা লিখতেন কখনও কখনও। কলেজে ছাত্রাবস্থায় গান গাওয়া ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য-সাধনায় নিয়োগ করলেন নিজেকে। শুরু থেকে ছোট গল্প বিশেষ না লিখে তিনি উপন্যাস লিখতেই শুরু করলেন।

১৯৪২ সালে তাঁর পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য পড়া স্থগিত রইল। অত্যন্ত দুরবস্থায় দিন কাটতে লাগল। এই সময়ে একমুঠো শুধু ভাত খেয়ে চাকরির চেষ্টায় বেরোতেন প্রতিদিন। তাঁর বন্ধু প্রাণতোষ ঘটক এই সময়ে তাঁর সহায় হয়েছিলেন। চাকরি তিনি পেলেন। কিন্তু পড়ার দিকে ঝোঁক থাকায় চাকরি করতে করতে মাত্র সামান্য কিছুদিন পড়ে তিনি বি, এ, পাস করলেন ১৯৪৩ সালে।

এরপরই শুরু হল নিরন্তর সাহিত্য সাধনা। এই সাধনায় তাঁর সঙ্গী ছিল মাত্র দুজন। একজন বন্ধু রমাপদ চৌধুরী, আরেকজন প্রাণতোষ ঘটক।

কিছুদিন লেখবার পর অধুনালুপ্ত দ্বন্দ্ব পত্রিকার পুজা সংখ্যায় তাঁর বড গল্প 'রাগিণী' প্রকাশিত হল এবং এই গল্পটিই তাঁকে প্রথম সাহিত্যিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করল, সুপরিচিত করল তাঁকে সাহিত্যিক সমাজে। গল্পটি প্রকাশিত হবাব পর ছায়াচিত্র জগতে প্রখ্যাত পরিচালকদেরও নজর পডল তাঁর লেখার ওপর।

এই সময়ে কিছুদিন তাঁব লেখা স্থগিত ছিল একটি বিশেষ কারণে। তিনি এই সময়ে অকস্মাৎ ভারতীয় দর্শনের বাছা বাছা বই পডতে শুরু করলেন। সম্ভবত এই সময়েই তাঁর অন্তরে মহাজাগতিক জীবনের এক জিজ্ঞাসা জেগেছিল। সে জিজ্ঞাসার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তিনি সব ছেড়ে শুরু করলেন ভারতীয় দর্শনের পুরনো পুঁথির পাতা ওলটাতে। কি পেলেন তিনি কে জানে। তবে এরপর থেকে তাঁর সাহিত্যে জীবনের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস আর জীবনদর্শনেব নূতনতর ব্যাখ্যার আভাস পাওয়া গেল। জীবন-বোধের গভীরতায় তিনি অনন্য হয়ে উঠতে লাগলেন। এইটেই এখনও তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

ছোট গল্প তিনি অতি সামান্যই লিখেছেন। তাঁর লেখা সবই উপন্যাস। 'চন্দন ডাঙার হাট', 'মৌন বসন্ত', 'মাথুর' থেকে শুরু করে বর্তমান উপন্যাস 'একান্ত আপন' পড়লেও ওই একই কথা মনে হবে যে তিনি চিন্তার জগতে ভেসে বেড়ান না। আসল রত্নের সন্ধানে ডুবতে জানেন।
